প্রাথমিক শিক্ষা বার্তা

মুজিববর্ষ সংখ্যা ● মার্চ ২০২২

বিষয়সূচি

বঙ্গবন্ধুর শিশুপ্রীতি ২

বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের বাংলাদেশ ৩

প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়ন বঙ্গবন্ধু থেকে শেখ হাসিনা ৫

বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা বিনির্মাণ রূপকল্প ৮

কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম ১৩

করোনা মহামারি ও প্রাথমিক শিক্ষায় তথ্যপ্রযুক্তি ১৬

করোনাকালে নেপ কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ ১৮

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর কার্যক্রম ২১

বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ইউনিটের কার্যক্রম ২৩

প্রাগম সচিব মহোদয়ের প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শন ২৪

Students' Assessment during the COVID-19 ২৬

সম্পাদকীয়

শিক্ষা একটি দেশের উন্নয়নের প্রধান হাতিয়ার। আর প্রাথমিক শিক্ষা তারই সূতিকাগার। বর্তমান জনবান্ধব সরকার শিক্ষার মাধ্যমে মানবোন্নয়নের যে কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে সেক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগ। সাংবিধানিক অঙ্গীকার পূরণ, মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণ এবং জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে সরকার যে নীতি প্রণয়ন করছে তা কার্যকর করছে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। প্রাথমিক শিক্ষা বার্তায় প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ে সরকারের সার্বিক কর্মকাণ্ডের একটি চিত্র প্রতিফলিত হবে। এটি তার পূর্বরূপ নেপ বার্তার মতো ষাণ্মাসিক নিউজলেটার হিসাবে প্রকাশিত হবে। তবে নেপ বার্তার চেয়ে এর পরিসর ও সংবাদের আওতা আরও বাড়বে। বাঙালি জাতি এবছর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবর্ষ 'মুজিববর্ষ' এবং মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন করছে। জাতীয় জীবনের এই গুরুত্বপূর্ণ দুটি বিষয়কে স্মরণীয় করে রাখার জন্য প্রাথমিক শিক্ষা বার্তার প্রথম সংখ্যা মুজিববর্ষ সংখ্যা হিসাবে প্রকাশিত হচ্ছে।

এ সংখ্যায় মুজিববর্ষকে প্রাধান্য দিয়ে বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্মের নানাদিক নিয়ে নিবন্ধ থাকছে। স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে বাংলাদেশের সাফল্য নিয়ে রচনা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। বর্তমান বিশ্ব করোনা মহামারি মোকাবেলা করছে। এর কারণে বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও শিক্ষাব্যবস্থা থমকে গেছে। সরকার এই অবস্থায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের শিখন কার্যক্রম চালু রেখে শিখন-ঘাটতি সর্বনিম্ন পর্যায়ে রাখার জন্য নানাবিধ উদ্যোগ গ্রহণ করে। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপসমূহ নিয়ে নিবন্ধ এতে স্থান পেয়েছে। সচিত্র সংবাদগুলোতে প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগের ২০২১ সালের উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলির সংক্ষিপ্ত তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে।

আগামী সংখ্যা থেকে প্রাথমিক শিক্ষা বার্তা নিয়মিত ষাণ্মাসিক নিউজলেটার হিসাবে প্রকাশিত হবে। এতে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সকল দপ্তরের সংবাদ-প্রতিবেদন প্রকাশিত হবে। প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগের আগ্রহী কর্মকর্তা-কর্মচারী ও শিক্ষকগণকে সচিত্র সংবাদ/প্রতিবেদন, প্রবন্ধ ই-মেইলের মাধ্যমে বা ডাকযোগে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো। সকলের সুচিন্তিত মতামত ও পরামর্শ আমাদের আগামী প্রকাশনাকে আরও সমৃদ্ধ করবে।

মোঃ শাহ আলম (অতিরিক্ত সচিব)
মহাপরিচালক
জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি

বঙ্গবন্ধুর শিশুপ্রীতি

শাহানাজ পারভীন
ইনস্ট্রাক্টর (সাধারণ), পিটিআই, ঢাকা

স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি, মহাবিজয়ের মহানায়ক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শুধু দেশকে পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করেননি, ভালোবাসতেন দেশকে ও দেশের মানুষকে। ধর্ম, বর্ণ, ধনী-গরিব, কৃষক-শ্রমিকসহ সকল শ্রেণির নাগরিকের অধিকার আদায়ে তিনি ছিলেন সোচ্চার। কর্তব্য পালনে ছিলেন মানবিক ও সচেতন। খুবই দয়ালু ছিলেন শিশুদের প্রতি। তাইতো বঙ্গবন্ধু নতুন প্রজন্মের কাছে আদর্শ ও দেশপ্রেমের প্রতীক। তিনি স্বপ্ন দেখতেন শিশুদের জন্য নিরাপদ আবাস গড়ার। ভাবতেন এই শিশুরাই একদিন তাঁর যোগ্য উত্তরসূরি হয়ে দেশকে উন্নত থেকে উন্নততর করবে। তাই সবসময় চাইতেন কোমলমতি শিশুরা যেন সৃজনশীল, মননশীল এবং মুক্তচিন্তার মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠে। বঙ্গবন্ধু যে শিশুদের সান্নিধ্য পছন্দ করতেন তা বোঝা যেতো যখন তিনি কচি-কাঁচার মেলা, খেলাঘরসহ নানান সংগঠনের শিশু বন্ধুদের অনুষ্ঠান ও সমাবেশে উপস্থিত হতেন। আর শিশুরাও তাঁকে খুব কম সময়ের মধ্যে আপন করে নিতো। শিশুদের প্রিয় মানুষ বঙ্গবন্ধু শিশুদের কল্যাণে ১৯৭৪ সালের ২২ জুন জাতীয় শিশু আইন জারি করেন। এই আইনের মাধ্যমে শিশুদের নাম ও জাতীয়তার অধিকারের স্বীকৃতি দেওয়া হয়। বঙ্গবন্ধুর ডাক নাম ছিলো 'খোকা'। আচরণে তিনি খোকাদের মতোই সরল ও নিষ্পাপ ছিলেন। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ার সময় বঙ্গবন্ধু সহপাঠীদেরকে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করতেন। গ্রামে-গঞ্জে সকলের সাথে করতেন খেলাধুলা। বই-খাতা কিনে দিতেন গরিব শিশুদের। রোদ বৃষ্টিতে কষ্ট পেলে নিজের ছাতাটাও দিয়ে দিতেন। একবার তো এক ছোট শিশুকে ছেঁড়া কাপড় পরে থাকতে দেখে নিজের পরনের চাদর খুলে দিয়েছিলেন।

স্বাধীনতার কিছুদিন পর, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী। ১৯৭২ সালের কোনো এক সকালে হাঁটতে বের হয়েছেন বঙ্গবন্ধু। সাথে হাঁটছেন বড় ছেলে শেখ কামালও। হঠাৎ দেখলেন একটি ছোট ছেলে বইয়ের ব্যাগ কাঁধে ঝুলিয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছে। বঙ্গবন্ধু কাছে ডাকলেন ছেলেটিকে। সে জানায় তার পা ব্যথা করছে। তৎক্ষণাৎ বাচ্চা ছেলেটির জুতা খুললেন বঙ্গবন্ধু। দেখলেন জুতার মধ্যে পেরেকের সূঁচালো মাথা বের হয়ে আছে। যার খোঁচায় ছোট শিশুটির কচি পা দিয়ে রক্ত ঝরছে। তখনই বঙ্গবন্ধু নির্দেশ দেন সুচিকিৎসার জন্য। ছেলেটিকে আদর করে হাতে কিছু টাকাও গুঁজে দিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু।

শুধু তাই নয়, বঙ্গবন্ধুর নির্দেশনায় ১৯৫৬ সালের ০৫ অক্টোবর ঐতিহ্যবাহী শিশু সংগঠন কচি-কাঁচার জাতীয় মেলা অনুষ্ঠিত হয়। শিক্ষা, সংস্কৃতিচর্চা, খেলাধুলার মাধ্যমে যেন অসাম্প্রদায়িক চেতনা, দেশ ও মানুষকে ভালোবাসার মানসিকতা নিয়ে শিশুরা বেড়ে ওঠে, এমনটা চেয়েছিলেন জাতির পিতা শেখ মুজিব।

শিশুপুত্র শেখ রাসেল যেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কাছে ছিলো বাংলাদেশের সব শিশুর প্রতীক। গরিব-ধনী সব শ্রেণির শিশুদের জন্য শিক্ষাকে নিশ্চিত করতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রাথমিক শিক্ষাকে করেন বাধ্যতামূলক। ১৯৭৩ সালে জাতীয়করণ করেন ৩৭ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়। তারই ধারাবাহিকতায় শিশুদের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, বিনোদন ও কল্যাণ নিশ্চিত করতে ব্যাপক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে যাচ্ছেন তাঁরই যোগ্য উত্তরসূরি বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি ২০০৮ সালে ক্ষমতায় আসার পর একে একে শিশু শ্রম নীতি-২০১০, শিশু আইন-২০১৩, শিশু নীতি-২০২১ প্রণয়ন করেন। পথশিশু, গরিব অসহায় শিশুদের কল্যাণ ও পুনর্বাসনে আর্থিক সহায়তা করছেন। শিশুদের মধ্যে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ চর্চা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা জাগ্রত করতে ১৯৯৬ সালে বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন ১৭ই মার্চকে 'জাতীয় শিশুদিবস' হিসাবে ঘোষণা করা হয়। এর ফলে বঙ্গবন্ধুর মতো নৈতিক গুণাবলির বলে বলীয়ান হয়ে বাংলার শিশুরা জ্ঞান অর্জনের প্রতি একাগ্র, সামাজিক সমতা প্রতিষ্ঠা ও সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়ে এগিয়ে থাকবে। তাই প্রতিবছর বিনম্র শ্রদ্ধা আর ভালোবাসা নিয়ে দেশে-বিদেশে সকল শিশু-কিশোর নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দিনটিকে বিশেষভাবে উদ্‌যাপন করে। বঙ্গবন্ধুর বর্ণিল জন্মদিনের ন্যায় নতুন প্রজন্মের হৃদয় রঙিন হোক। মুজিব জন্মশতবার্ষিকীতে এই হোক আমাদের প্রত্যয়।■

বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের বাংলাদেশ

ড. সৈয়দ শামসুদ দোহা
উপ-প্রকল্প পরিচালক
প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের প্রোফাইল প্রণয়ন প্রকল্প
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

আমার এ ক্ষুদ্র জীবনে ২০২১ একটি উল্লেখযোগ্য বছর, কারণ স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী এবং সবুজের জমিনে রক্তিম সূর্যখচিত মানচিত্রের এদেশটির সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন করছি আমরা। পরাধীন ব্রিটিশ ভারত থেকে পাকিস্তানের কালো অধ্যায় পেরিয়ে জন্ম হয় বাংলাদেশ নামক স্বাধীন রাষ্ট্রের। শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি ত্রিশ লক্ষ শহিদ ও তিন লক্ষ মা-বোন, যাঁদের মহান ত্যাগের বিনিময়ে এই লাল সবুজ পতাকা বিশ্বমানচিত্রে স্থান পেয়েছে। সেই সাথে স্মরণ করছি বিশ্বসভায় বাঙালিকে আত্মপরিচয় নিয়ে গর্বিত জাতি হিসেবে যিনি মাথা উঁচু করে চলার ক্ষেত্র রচনা করেন, সেই বাঙালি ধ্রুবতারা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুকে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শুধুমাত্র একটি নাম নয়– একটি ইতিহাস, একটি দেশের জন্মের ইতিহাস, স্বাধীনতার ইতিহাস, একটি মানচিত্রের ইতিহাস, একটি স্বাধীন পতাকার ইতিহাস। বঙ্গবন্ধু, বাংলাদেশ ও স্বাধীনতা এই শব্দত্রয় আলাদা করে ভাবা যায় না। বঙ্গবন্ধু বাঙালির মুক্তি আর স্বাধীনতার জন্য আজীবন সংগ্রাম করেন। বাবা-মায়ের আদরের খোকা বাঙালিকে ভালোবেসে হয়ে ওঠেন বঙ্গবন্ধু। তাঁর জীবন সংগ্রামের জীবন, আন্দোলনের জীবন, কারাগারের জীবন, বন্দির জীবন। বাঙালিকে ভালোবেসে জীবনের সকল সুখ বিসর্জন দেন, বারবার করেন কারাবরণ। সবুজশ্যামল বাংলার এই সূর্যসন্তান পারিবারিকভাবেই উন্নত নৈতিক মূল্যবোধের ধারক। যে মূল্যবোধের উৎস পারিবারিক পরিমণ্ডল। "অসমাপ্ত আত্মজীবনী" গ্রন্থে বঙ্গবন্ধু তাঁর পিতার একটি বিশেষ উপদেশ উদ্ধৃত করেন- "আর একটা কথা মনে রেখ, 'sincerity of purpose and honesty of purpose' থাকলে জীবনে পরাজিত হবা না।" (পৃষ্ঠা ২১)

১৯২০ সালের ১৭ মার্চ থেকে ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত শৈশব, কৈশোর এবং যৌবনের ১৮ বছর পেরিয়ে তারপর আর ফিরে তাকানোর সময় হয় নাই। স্কুল জীবন থেকেই মুজিবের মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলির বিকাশ ঘটে। ১৯৩৯ হতে ছাত্র রাজনীতি ও নেতৃত্ব প্রদান থেকে আমৃত্যু ১৯৭৫-এর আগস্ট পর্যন্ত ৩০ বছরের রাজনৈতিক জীবনে পাকিস্তানের ২৪ বছরের শাসন আমলে ১২ বছর কেটেছে তাঁর জেলখানায়, আঠার বার কারারুদ্ধ হয়েছেন, ২৪টা মামলায় তাঁকে আদালতে দাঁড়াতে হয়েছে, দুইবার তাঁকে মৃত্যুর সম্মুখীন হতে হয়। এসকল ঋণে অর্জিত আজকের লাল সবুজের পতাকা, গর্ব ও স্বপ্নের বাংলাদেশ, উন্নত সমৃদ্ধ তথা ডিজিটাল বাংলাদেশ। সর্বোপরি বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা এখন স্বপ্ন নয়, কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যের দোরগোড়ায়, যার সকল কৃতিত্ব, হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বাঙালি জাতিসত্তার স্বপ্নদ্রষ্টা, আমাদের গৌরব ও সাফল্য গাথার মূলশক্তি, স্বাধীনতার ঘোষক ও মহানায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

জাতির পিতার কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ১৯৯৬ সালে দেশ পরিচলনায় আসে স্বাধীনতার পক্ষশক্তি, এরপর দেশটিকে আবার বাঙালির মুক্তির পথে পরিচালনার কার্যক্রম শুরু হয়। টানা প্রায় ১৩ বছর বঙ্গবন্ধু-কন্যা শেখ হাসিনার সুদক্ষ নেতৃত্বে আমাদের অর্থনৈতিক মুক্তি লাভের পথ সুগম হয়েছে। বর্তমান সরকার কর্তৃক দরিদ্র ও প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর জন্য বিভিন্ন ভাতা চালু, তাদের জন্য বিশেষ কর্মসূচি, যেমন : আশ্রয়ণ প্রকল্প, ঘরে ফেরা কর্মসূচি, কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপনের মতো কর্মসূচি দারিদ্র্য বিমোচন

এবং প্রান্তিক মানুষের জীবনমান উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রেখেছে। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রায় ৫ কোটি মানুষকে সামাজিক সুরক্ষার আওতায় আনা হয়েছে। ২০০৫-০৬ অর্থবছরে দারিদ্র্যের হার ছিল ৪১.৫ শতাংশ কিন্তু বর্তমান সেই হার হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে ২০.৫ শতাংশ। বর্তমান বাংলাদেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি দেশ। সরকারের কৃষিবান্ধব উন্নয়ন নীতির কারণে এ অর্জন সম্ভব হয়েছে। ২০১০ সাল থেকে মাধ্যমিক পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের বছরের প্রথম দিনে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক দেওয়া হচ্ছে। ২৬ হাজার ১৯৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং ৬৮৫টি মাধ্যমিক স্কুল ও কলেজ জাতীয়করণ করেছে সরকার। কারিগরি শিক্ষাকে মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছানোর জন্য প্রতি উপজেলায় একটি করে সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ স্থাপন করা হচ্ছে। প্রতি জেলায় একটি করে সরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট ও সকল বিভাগীয় শহরে সরকারি মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপন কার্যক্রম চলমান। ২০০৯ থেকে এ পর্যন্ত ৪ হাজার ৬৬১ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত করা হয়েছে। শিক্ষাক্ষেত্রে শতভাগ লক্ষ্য অর্জনের জন্য কাজ করছে সরকার। সরকারি বেসরকারি পর্যায়ে ১০০টি অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার কাজ এগিয়ে চলছে। ইতোমধ্যে ১৫টি অর্থনৈতিক অঞ্চলে শিল্প-কারখানা স্থাপনের কাজ শুরু হয়েছে। সারাদেশে ২ ডজনের বেশি হাইটেক পার্ক এবং আইটি ভিলেজ নির্মাণের কাজ এগিয়ে চলছে। যুব সমাজকে ফ্রিল্যান্সিংয়ের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে। এক সময় প্রবল ক্ষুধা ও দারিদ্র্যের চাপে পিষ্ট হতে থাকা বাংলাদেশের অর্থনীতি আজ মজবুত ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। অর্থনৈতিক অগ্রগতির সূচকে বিশ্বের শীর্ষ ৫টি দেশের একটি এখন বাংলাদেশ। আই.এম.এফ-এর হিসাব অনুযায়ী পিপিপির ভিত্তিতে বাংলাদেশ অর্থনীতির অবস্থান ৩০তম। প্রাইস ওয়াটার হাউজ কুপারস-এর তথ্য অনুযায়ী ২০৪০ সাল নাগাদ বাংলাদেশের অর্থনীতি বিশ্বে ২৩তম স্থান দখল করবে। জিডিপি প্রবৃদ্ধির উচ্চহার অর্জনের পাশাপাশি নানা সামাজিক সূচকে বাংলাদেশ অভাবনীয় সাফল্য পেয়েছে। দারিদ্র্য বিমোচন, নারীর ক্ষমতায়ন, শিশু ও মাতৃ মৃত্যুর হার হ্রাস, লিঙ্গবৈষম্য দূরীকরণ, শিক্ষার হার ও গড় আয়ু বৃদ্ধিসহ বিভিন্ন সূচকে বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ায় তার প্রতিবেশীদেরই শুধু না অনেক উন্নত দেশকেও ছাড়িয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে। এসডিজি বাস্তবায়নে এসেছে ঈর্ষণীয় সাফল্য। বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ আজ আত্মপ্রত্যয়ী বাংলাদেশ।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা পেল বাংলাদেশ। জাতিসংঘের এই স্বীকৃতি দেশের জন্য গৌরব ও সম্মানের। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নিজের জীবন দেশ ও দেশের মানুষের কল্যাণে নিবেদন করেছিলেন। তাঁর মনে ছিল না কোনো ভোগবিলাসিতা, ছিল না কোনো অর্থলিপ্সা, ছিল না কোনো হিংসাবিদ্বেষ, ছিল না কোনো স্বজনপ্রীতি, ছিল না কোনো আত্ম-অহমিকা। তিনি খুব সহজ সরল সাধারণ জীবন যাপন করতেন। তিনি দেশের মানুষকে তার বিশাল হৃদয় দিয়ে ভালোবাসতেন। আজ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকীতে আমাদের প্রত্যাশা হবে, শুধু মুখে নয় বাস্তবে মুজিব আদর্শ প্রতিষ্ঠা করা এবং বঙ্গবন্ধুর জীবনকালের নানা জনকল্যাণমুখী কর্ম করে দেশকে আরও উন্নত ও সমৃদ্ধ করা। সবার প্রত্যাশা থাকবে জাতির পিতার আর্দশ ধারণ ও বহন করা। আজ আমাদের অঙ্গীকার হবে বঙ্গবন্ধুর মতো নিঃস্বার্থভাবে কাজ করা, অহংকারমুক্ত, শোষণমুক্ত সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করা; মানুষের সাথে মানুষের ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে সকল ধর্মের, বর্ণের মানুষের সাথে শান্তিপূর্ণ সহঅবস্থান নিশ্চিতের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়ে তোলা; জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ে তুলে বাংলাদেশকে বিশ্বের দরবারে উন্নত দেশের সারিতে দাঁড় করানো। তাহলেই জাতির এই মহান নেতার জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন সফল ও সার্থক হবে বলে আমার বিশ্বাস।■

প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়ন
বঙ্গবন্ধু থেকে শেখ হাসিনা

মাহবুবুর রহমান, সহকারী বিশেষজ্ঞ, নেপ

'আমাদের শিক্ষা হবে গণমুখী শিক্ষা।' – ছাত্র ইউনিয়নের কাউন্সিলে (৯ এপ্রিল ১৯৭২) শেখ মুজিব

শিক্ষা ছাড়া জাতির উন্নতি যে সম্ভব নয়, তা অনুধাবন করেছিলেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। সেটা তাঁর শিক্ষাদর্শনে প্রতিফলিত হয়েছে। ১৯৬২ সালে শিক্ষকদের উদ্দেশে এক ভাষণে বঙ্গবন্ধু বলেন, 'আগামী প্রজন্মের ভাগ্য শিক্ষকদের ওপর নির্ভর করছে। শিশুদের যথাযথ শিক্ষার ব্যত্যয় ঘটলে কষ্টার্জিত স্বাধীনতা অর্থহীন হবে।'

১৯৭০ সালের নির্বাচনের আগে ২৮ অক্টোবর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রেডিও ও টেলিভিশনে এক নির্বাচনী ভাষণে শিক্ষা বিষয়ে সুস্পষ্ট কিছু প্রস্তাব রাখেন। যথা, প্রথমত, 'সুষ্ঠু সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য শিক্ষাখাতে পুঁজি বিনিয়োগের চেয়ে উৎকৃষ্ট বিনিয়োগ আর কিছু হতে পারে না। দ্বিতীয়ত, 'নিরক্ষতা অবশ্যই দূর করতে হবে। পাঁচ বছর বয়স্ক শিশুদের বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষাদানের জন্যে একটি ক্র্যাশ প্রোগ্রাম চালু করতে হবে। তৃতীয়ত, 'দারিদ্র্য যেন উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে মেধাবীদের জন্য বাধা হয়ে না দাঁড়ায়, সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে।'

স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের উপযোগী সমাজগঠনমূলক একটি সার্বিক শিক্ষাব্যবস্থার রূপরেখা প্রণয়নের জন্য ১৯৭২ সালের ২৬ জুলাই কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশন গঠন করেন বঙ্গবন্ধু। কমিশন শিক্ষাখাতে পর্যাপ্ত বরাদ্দ, বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রসার, শিক্ষকের মর্যাদা বৃদ্ধি ও গবেষণার ওপর গুরুত্ব দেয়। এই রিপোর্ট (৩৬ অধ্যায়) পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, এর প্রথম অধ্যায়ে শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যাবলি, চতুর্থ অধ্যায়ে শিক্ষার মাধ্যম ও বিদেশি ভাষার স্থান, পঞ্চম অধ্যায়ে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর হার, ষষ্ঠ অধ্যায়ে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা এবং সপ্তম অধ্যায়ে প্রাথমিক শিক্ষা নিয়ে বঙ্গবন্ধুর শিক্ষাদর্শন বিস্তারিত প্রকাশ পেয়েছে। বিজয়ের মাত্র সাত মাসের মধ্যে এই কমিশন গঠন করা দেশের জন্য একটি সময়োপযোগী শিক্ষাব্যবস্থা তৈরি করার প্রতি বঙ্গবন্ধুর অপার আগ্রহের পরিচয় বহন করে।

১৯৭৪ সালে ড. কুদরাত-এ-খুদার কাছ থেকে বাংলাদেশের প্রথম শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট গ্রহণ করছেন বঙ্গবন্ধু

১৯৭২ সালের বাজেটে প্রতিরক্ষা খাতের চেয়ে শিক্ষাখাতে তিন কোটি ৭২ লাখ টাকা বেশি বরাদ্দ দেওয়া হয়। বঙ্গবন্ধু সরকার কর্তৃক প্রণীত স্বাধীন বাংলাদেশের সংবিধানে শিক্ষার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। ৭২-এর সংবিধানের ১৭, ১৯, ২৩, ২৫, ২৮, এবং ৪১ নং অনুচ্ছেদে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বঙ্গবন্ধুর শিক্ষা-ভাবনা প্রতিফলিত হয়েছে।

বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে ১৯৭২ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি শিক্ষামন্ত্রী পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক প্রদান ও ষষ্ঠ হতে মাধ্যমিকে ৪০ ভাগ কম দামে পাঠ্যপুস্তক সরবরাহের কথা ঘোষণা করেন। গণশিক্ষা প্রসারে পল্লী উন্নয়ন বিগ্রেড গঠন করে নিরক্ষরতা দূরীকরণে ৬ মাসের কার্যক্রম গ্রহণ করতে আড়াই কোটি টাকা বরাদ্দের ঘোষণা দেন বঙ্গবন্ধু।

বঙ্গবন্ধু ১৯৭২ সালের ১ জুলাই বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে সরকারিকরণ করে শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধিসহ যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা করেন এবং ৬ হাজার ৫০০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে সরকারিকরণ করেন। এই বছরের ২৮ ডিসেম্বর সরকার গ্রামীণ এবং শহরের সাহায্যপ্রাপ্ত ১৮৩৪টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, এম.এফ.পি স্কুলের ২৬ হাজার ৭৪৪টি এবং নিয়ন্ত্রিত ৫০৭টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকসহ দায়িত্ব গ্রহণ করে।

স্বাধীনতার পর জাতীয়করণের আগ পর্যন্ত সহকারী শিক্ষকদের বেতন স্কেল ছিল ১২০ টাকা, বার্ষিক ইনক্রিমেন্ট ছিল ২ টাকা, প্রধান শিক্ষকের বেতন স্কেল ছিল ১৩০ টাকা, ইনক্রিমেন্ট ৩ টাকা। এ বেতন পোস্ট অফিসের পিওনের মাধ্যমে হাটবারে ভেঙে ভেঙে দেয়া হতো।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এই কষ্টকর অবস্থা থেকে প্রাথমিক শিক্ষকদের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য ১৯৭৩ সালের ১ জুলাই হতে ১৯৭৫ সালের জুলাই পর্যন্ত মাত্র ৩ বছরে ৩৬ হাজার ১৬৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ করে ১ লাখ ৫৫ হাজার ২৩জন শিক্ষকের চাকরি সরকারিকরণ করেন। একই বছরের ২২ জুলাই জাতীয়করণকৃত বিদ্যালয় ও শিক্ষকদের প্রয়োজনীয় পদ সৃষ্টির সরকারি আদেশ জারি করেন। ১ জুলাই ১৯৭৩ হতে জাতীয় বেতন স্কেলে অষ্টম গ্রেড শিক্ষকের সংখ্যা ছিল ৭৬ হাজার ৬৮১জন, নবম গ্রেডে ৭২ হাজার ৭২৪জন এবং দশম গ্রেডে ৫ হাজার ৬১৮জন। এটিকে আইনিভিত্তি দিতে The Primary Schools (Taking over) Ordinance ১৯৭৩ জারি করা হয়, পরে The Primary Schools (Taking over) Act-1974 প্রবর্তনপূর্বক অধ্যাদেশটি রহিত করা হয়। তখন প্রশিক্ষণবিহীন প্রাথমিক শিক্ষকদের বেতন স্কেল ১৪৫ টাকা, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকেরা পেতেন ২২০ টাকা। প্রধান শিক্ষকদের দায়িত্ব ভাতা ছিল ১০ টাকা।

নারীশিক্ষা প্রসারে ১৯৭৩ সালের ১ জানুয়ারি থেকে ছাত্রীদের অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত বেতন দিতে হবে না ঘোষণা করা হয়। একই বছরের ৭ মার্চে স্বাধীন দেশে প্রথম সাধারণ নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে ক্ষমতা গ্রহণ করে বঙ্গবন্ধু শিক্ষাব্যবস্থা গণমুখী এবং সার্বজনীন করতে বিনামূল্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের বই বিতরণ শুরু করেন। তিনি প্রাথমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক করে শিক্ষাকে সহজলভ্য করে দেন।

প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ইচ্ছা অনুসারে বাংলাদেশের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় (১৯৭৩-৭৮) শিক্ষাকে দক্ষ জনগোষ্ঠী গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়। ১৯৭৩ সালে ১৩ ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তব্যে বলেন, "শুধু কাগজে কলমে আর বই পড়েই না, অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাবে।" একই সালে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে ছাত্র ইউনিয়নে ত্রয়োদশ কাউন্সিলে তিনি বলেন, "বাবারা, একটু পড়ালেখা শিখো। যতই জিন্দাবাদ আর মুর্দাবাদ করো, ঠিকমতো পড়াশোনা না শিখলে কোনও লাভ হবে না।" শিশুশিক্ষার ওপর তিনি বিশেষ জোর দেন। বস্তুত শিক্ষার ভিত রচিত হয় প্রাথমিক শিক্ষায়। শিশুশিক্ষা ক্ষেত্রে তাঁর এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ হলো, সব প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ। ১৯৭৪ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি প্রাথমিক বিদ্যালয় অধিগ্রহণ আইন, ১৯৭৪ পাস করে দেশের সব প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ করা হয়। এছাড়াও ১৯৭৪ সালে বঙ্গবন্ধুই প্রথম বাংলাদেশে শিশু সুরক্ষা আইন প্রণয়ন করেন।

১৯৭৪ সালে বাংলাদেশ মহিলা আওয়ামী লীগের প্রথম বার্ষিক সম্মেলন উদ্বোধনকালে বঙ্গবন্ধু তাঁর ভাষণে শিক্ষার উদ্দেশ্য ও নারীশিক্ষা সম্বন্ধে বলেন, 'শতকরা ২০জন শিক্ষিতের দেশে নারীর সংখ্যা আরও নগণ্য। ... ক, খ, শিখলেই শিক্ষিত হয় না, সত্যিকারের আলোকপ্রাপ্ত হইতে হইবে।' ১৯৭৪ সালে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সাহিত্য সম্মেলনের বক্তৃতায় তিনি বলেন, 'একটি সুষ্ঠু জাতি গঠনে শিল্প, যোগাযোগ ব্যবস্থা বা অন্য সবক্ষেত্রে যেমন উন্নয়ন প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন চিন্তা ও চেতনার ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করা। আমি সর্বত্রই একটি কথা বলি, সোনার বাংলা গড়তে হলে সোনার মানুষ চাই। সোনার মানুষ আকাশ থেকে পড়বে না, মাটি থেকেও গজাবে না। এই বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষের মধ্য থেকেই তাঁদের সৃষ্টি করতে হবে।'

প্রাথমিক শিক্ষায় ঝরে পড়ার হার হ্রাস, ছাত্র ভর্তির হার বৃদ্ধি, শিক্ষকদের চাকরিকালীন নানা প্রশিক্ষণ কার্যক্রম, উন্নত শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক, অবকাঠামোগত উন্নয়ন, পরিবীক্ষণ, শিক্ষার্থী-মূল্যায়ন, বৈষম্য হ্রাস ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে ইতিবাচক পরিবর্তন সূচিত হয়েছে তার সূচনা হয়েছিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হাত ধরে।

বঙ্গবন্ধুর শিক্ষা ভাবনাই শেখ হাসিনা সরকারের আদর্শ। বঙ্গবন্ধুর দেখা স্বপ্ন তার সুযোগ্য কন্যা, বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিরলসভাবে বাস্তবায়ন করে যাচ্ছেন। যেখানে শিশুদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভর্তির হার ছিল মাত্র ৬১ শতাংশ, শেখ হাসিনা সরকারের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বর্তমানে তা প্রায় শতভাগ। জাতীয়ভাবে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী মূল্যায়নের কোনো ব্যবস্থা ছিল না। তাই শিক্ষার্থীদের মেধাযাচাই ও মূল্যায়নের জন্য ২০০৯ সাল হতে সারাদেশে অভিন্ন প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে 'প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী' পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়, যা এখনও চালু রয়েছে। সরকারের সর্বাত্মক প্রয়াসে ২০১০ সাল থেকে শিক্ষার্থীদের হাতে বছরের প্রথমদিন বিনামূল্যে নতুন পাঠ্যবই বিতরণ ব্যবস্থা চালু করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, যা বিশ্বে নজিরবিহীন।

বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত কেজি স্কুল বা অনুরূপ অননুমোদিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের দৌরাত্ম্য থেকে রক্ষা করে শিশুর মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতে সরকার

২০১১ সালের পর থেকে অভিন্ন শিক্ষাক্রমে সারাদেশে প্রাক-প্রাথমিক (৫ বছর বয়স) শিক্ষাকার্যক্রম চালু করেছে। শিক্ষার্থীদের মেধাবিকাশের পাশাপাশি তাদের শারীরিক ও মানসিক উৎকর্ষ সাধন ও নেতৃত্বের গুণাবলি বিকাশের জন্য বহুমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পড়াশুনার পাশাপাশি খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডসহ নানা সহপাঠ কার্যক্রমে সর্বদা উদ্বুদ্ধ করেন। এরই ধারাবাহিকতায় প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কাব স্কাউট দল, গার্লস গাইড এবং হলদে পাখির দল-এর কার্যক্রমকে আরও শক্তিশালী করা হয়েছে। গঠন করা হয়েছে স্টুডেন্ট কাউন্সিল, ক্ষুদে ডাক্তার দল, প্রাক্তন শিক্ষার্থী অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের মতো সংগঠন। ২০১১ খ্রিষ্টাব্দ হতে প্রতি বছর স্কুল পর্যায় থেকে শুরু করে জাতীয় পর্যায়ে বঙ্গবন্ধু ও বঙ্গমাতা ফুটবল টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

বঙ্গবন্ধুর ন্যায় শেখ হাসিনা সরকার শিশুদের সার্বিক অধিকারকে সুরক্ষিত করার জন্য জাতীয় শিশুনীতি, ২০১১ প্রণয়ন করে। একইভাবে সরকার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সুরক্ষার বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে ২০১২ সালে ৩৭ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দপ্তরি-কাম-নৈশ প্রহরী নিয়োগ করে। শিক্ষার সুবিধাবঞ্চিত গরিব ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা নিশ্চিত করার বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে সরকার শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট আইন, ২০১২ প্রণয়ন করে, গঠন করে শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট। বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের জন্য প্রতিবন্ধী শিশুর সমন্বিত/বিশেষ শিক্ষা নীতিমালা, ২০১৮ প্রণয়ন করা হয়। প্রাথমিক শিক্ষার সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে আনা ও ধরে রাখা। এই কঠোর বাস্তবতা মোকাবেলায় সরকার সারাদেশে শতভাগ উপবৃত্তি চালু করেছে। যা সরাসরি শিক্ষার্থীর অভিভাবকের মোবাইল একাউন্টে প্রেরণ করা হচ্ছে।

বঙ্গবন্ধু ১৯৭৩ সালে যে যুগান্তকারী দুঃসাহসী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন, তারই ধারাবাহিকতায় তাঁর যোগ্য উত্তরসূরি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১৩ সালে ২৬ হাজার ১৯৩টি বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং এসব বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণকেও সরকারিকরণ করেন। এই কার্যক্রমের ধারাবাহিকতায় শিক্ষকদের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য ২০১৪ খ্রিষ্টাব্দে প্রধান শিক্ষকদের ২য় শ্রেণির মর্যাদা প্রদান করেন। একই সাথে ২০২০ সালে সহকারী শিক্ষকদের বেতন স্কেল উন্নীত করে ১৩তম গ্রেড প্রদান করেন, যা পূর্বে ছিল ১৫তম গ্রেড।

একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় শিক্ষকগণকে আরও দক্ষ ও প্রশিক্ষিত করে তোলার জন্য শিক্ষক প্রশিক্ষণের বিষয়টিতে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সেই লক্ষ্যে এক বছরব্যাপী সার্টিফিকেট-ইন-এডুকেশন (সি-ইন-এড)-এর পাশাপাশি ২০১২ সাল থেকে এক বছর ছয় মাসব্যাপী ডিপ্লোমা-ইন-এডুকেশন (ডিপিএড) কোর্স চালু করা হয়, যা বর্তমানে সফলতার সাথে পরিচালিত হচ্ছে। পিইডিপি-৩ (২০১১-২০১৬)-এর আওতায় শিক্ষক ও প্রশিক্ষক সবাইকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। পিইডিপি-৩-তে 'এডুকেশন ফর অল'-এর আওতায় একীভূত শিক্ষাকার্যক্রম নিশ্চিত করার কার্যক্রম শুরু হয়েছে এবং এখনও অব্যাহত আছে।

বর্তমান সরকার ২০১৭ সাল থেকে ব্রেইল পদ্ধতির পাঠ্যপুস্তক প্রবর্তন করেছে, পূর্বে কেউ এটি নিয়ে তেমন চিন্তাও করেনি। একই সাল থেকে প্রাক-প্রাথমিক স্তরে চাকমা, মারমা, সাদরি, ত্রিপুরা ও গারো - এ ৫টি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ৮২ হাজার ৮৯৬ শিক্ষার্থীর জন্য নিজ নিজ মাতৃভাষায় রচিত ২ লাখ ২৬ হাজার ৫৫৮ পাঠ্যপুস্তক বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়, বর্তমানে এটি নিয়মিত নিয়মে চলমান রয়েছে।

বর্তমান সরকার শুধুমাত্র শিক্ষক, শিক্ষার্থী বা প্রশিক্ষকের দক্ষতা বৃদ্ধির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি। নতুন ভবন নির্মাণ, পুনর্নির্মাণ, সংস্কার, সুসজ্জিত সীমানা বেষ্টনি, নিরাপদ পানীয় জলের ব্যবস্থা, স্যানিটেশন ও ওয়াশব্লক স্থাপনসহ অবকাঠামোগত ব্যাপক উন্নয়ন সাধন করা হয়েছে এবং আরও নতুন নতুন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে। প্রায় সকল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে স্থাপন করা হয়েছে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম। একই সাথে ডিজিটাল প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্পের আওতায় সকল প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট এবং সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ইন্টারেক্টিভ বোর্ড সরবরাহ শুরু হয়েছে।

২০২০ সাল থেকে ছড়িয়ে পড়া করোনা মহামারিতে শিক্ষার্থীদের পড়াশোনা যাতে থমকে না যায়, বর্তমান সরকার সেজন্য চালু করে সংসদ বাংলাদেশ টেলিভিশন ও বাংলাদেশ বেতারের মাধ্যমে কোমলমতি শিশুদের জন্য 'ঘরে বসে শিখি' শ্রেণিকার্যক্রম।

বঙ্গবন্ধুর গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ ও স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য আন্তরিকতা ও নিষ্ঠা নিয়ে কাজ করলেই সমৃদ্ধ জাতি হিসেবে বিশ্ব মঞ্চে আমরা মাথা উঁচু করে স্বমহিমায় উদ্ভাসিত হতে পারব এবং গড়তে পারব বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা। ■

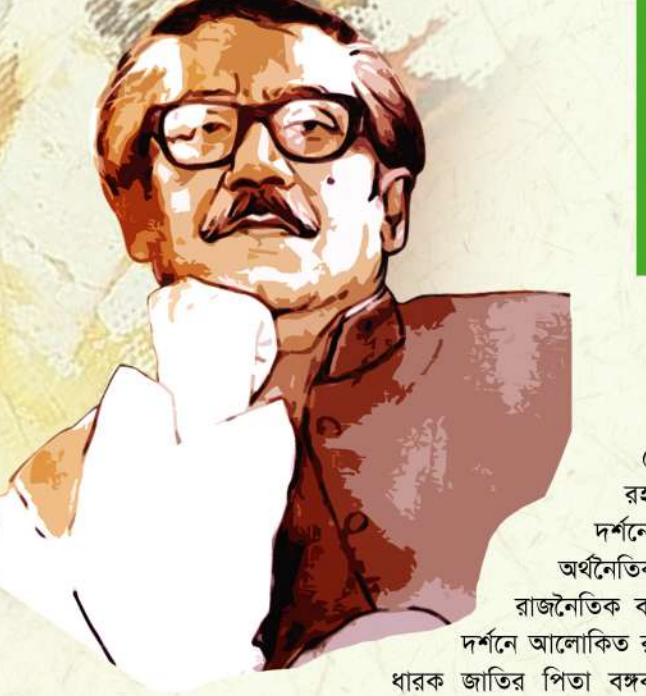

বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা বিনির্মাণ রূপকল্প এবং মধ্যম আয়ের অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ

ড. উত্তম কুমার দাশ (যুগ্মসচিব)
পরিচালক (প্রশিক্ষণ), প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

সোনার বাংলা বিনির্মাণ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক ও উন্নয়ন দর্শনের অন্তর্নিহিত কথা। তাঁর এই দর্শনের মূলে রয়েছে বাংলাদেশকে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত করার লক্ষ্যে অর্থনৈতিকভাবে স্বনির্ভরতা অর্জন এবং সামাজিক শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করা। তাঁর রাজনৈতিক বক্তৃতায় বহুবার এ দর্শনের মূলকথা প্রতিধ্বনিত হয়েছে। এমনই দর্শনে আলোকিত রাষ্ট্র বাংলাদেশকে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্নের ধারক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। এ প্রবন্ধে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা বিনির্মাণের রূপকল্প ও সূচনাপর্ব এবং এরই ধারাবাহিকতায় বর্তমান সরকারের টেকসই উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় মধ্যম আয়ের পথের বাংলাদেশকে সংজ্ঞায়িত করা হবে।

বঙ্গবন্ধুর বক্তৃতামালা পর্যালোচনা করলে সহজেই ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সোনার বাংলা বিনির্মাণের প্রাক-কথা অনুমিত হবে। ১৯৭০ সালের নভেম্বরে সাধারণ নির্বাচনের পূর্বে বঙ্গবন্ধু এক বেতার ভাষণে বলেন, "সুজলা-সুফলা-শস্য-শ্যামলা এই সোনার বাংলাকে শোষণের চারণক্ষেত্রে পরিণত করার দুরভিসন্ধিতে মেতে নেপথ্যের একশ্রেণির কুচক্রীরা যে মতলব এঁটেছিল, এই বাংলার 'মীরজাফররাই' বারবার সে মতলবের বাস্তবায়নে প্রধান হাতিয়ার হয়ে কাজ করে এসেছে, আর তাই এদেশের মানুষের আজ এ দুরবস্থা"। এ বক্তৃতায় ৬ দফা প্রসঙ্গে বঙ্গবন্ধু দৃঢ় কণ্ঠে বলেন, "৬ দফা বাংলার শ্রমিক-কৃষক-মজুর-মধ্যবিত্ত তথা আপামর মানুষের মুক্তির সনদ, ৬ দফা শোষকের হাত থেকে শোষিতের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার ছিনিয়ে আনার হাতিয়ার, ৬ দফা মুসলিম-হিন্দু-খৃস্টান-বৌদ্ধদের নিয়ে গঠিত বাঙ্গালি জাতির স্বকীয় মহিমায় আত্মপ্রকাশ আর নির্ভরশীলতা অর্জনের চাবিকাঠি।"

১৯৭১ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি ঢাকার তেজগাঁওয়ে বিদেশি কূটনীতিক, সরকারি কর্মকর্তা, শিল্প ও ব্যবসায়ী মহলের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে বঙ্গবন্ধু বলেন, "আমরা সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে বিশ্বাসী। তবে তা বিপ্লবের মাধ্যমে নয়, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে বিবর্তনের মাধ্যমেই অর্জিত হবে। সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি ছাড়া ৫৫ হাজার বর্গমাইল এলাকায় ৭ কোটি লোক কিছুতেই বেঁচে থাকতে পারে না। স্বাধীনতার সময় বাংলা সোনার দেশ ছিল, কিন্তু স্বাধীনতার পর থেকে ২৩ বছর একচেটিয়া পুঁজিবাদের শোষণে সোনার বাংলার সর্বত্র বুভুক্ষু মানুষের অর্তনাদে ভরে উঠেছে।" এ ভাষণে তিনি আরও বলেন, "জয় বাংলা আন্দোলন কেবলমাত্র রাজনৈতিক স্লোগান নয়। এটা বাংলার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক স্বাধিকারের প্রতীক। এই আন্দোলন চলবেই। সেই সঙ্গে চলবে শোষণহীন সমাজব্যবস্থা কায়েমের আন্দোলন।" বঙ্গবন্ধু তাঁর বক্তৃতায় বহুসংখ্যক বার বাংলাদেশকে সোনার বাংলায় পরিণত করার স্বপ্নের কথা ব্যক্ত করেন।

বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা বিনির্মাণ রূপকল্প

বঙ্গবন্ধুর বক্তৃতামালা এবং উন্নয়ন পদক্ষেপ পর্যালোচনা করলে এ কথা স্পষ্ট হবে যে, তিনি এদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও মূল্যবোধ অক্ষুণ্ন রেখেই বাংলাদেশকে সোনার বাংলায় রূপান্তরের স্বপ্ন দেখেছিলেন। বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলার নির্ধারিত সীমানা ৫৫ হাজার ১৪৩ বর্গমাইলের সবুজ বাংলা, এ বাংলাদেশ– জাতি হিসেবে বাঙালি জাতি এবং নাগরিক হিসেবে বাংলাদেশি। যে বাংলাদেশের বৈশিষ্ট্য হবে ক্ষুধামুক্ত ও দারিদ্র্যমুক্ত, বঞ্চনামুক্ত, বৈষম্যহীন, শোষণহীন এবং অসাম্প্রদায়িক। যেখানে প্রতিষ্ঠিত হবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতির শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা। এ ব্যবস্থায় নাগরিক ভোগ করবে মৌলিক মানবাধিকার, আইনের শাসন, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমতা। উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও বণ্টনের মালিক হবে বাংলাদেশি জনগণ এবং প্রতিষ্ঠিত হবে মানবাধিকার, ন্যায়বিচার ও স্বাধীনতা এবং ক্ষমতায়নের সকল উৎসমূলই হবে এদেশের জনগণ। যে ব্যবস্থায় গড়ে উঠবে দেশপ্রেমে

উদ্বুদ্ধ জ্ঞানভিত্তিক সমাজ এবং সুখী-সমৃদ্ধ রাষ্ট্র। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বরে বিজয় লাভের পর বঙ্গবন্ধু স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি। এদিন রেসকোর্স ময়দানে প্রদত্ত তাঁর ভাষণটি এখানে প্রণিধানযোগ্য, কেননা, ১৯৭১ সালের ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণটি ছিল এদেশের স্বাধীনতার রূপরেখা, ঠিক তেমনি রেসকোর্সের ভাষণটি ছিল ভবিষ্যৎ বাংলাদেশের সমৃদ্ধি ও উন্নয়নের রূপকল্প। এ ভাষণে তিনি বলেছিলেন,"গত ৭ই মার্চ আমি এই রেসকোর্সে বলেছিলাম 'দুর্গ গড়ে তোলো'। আজ আবার বলছি, আপনারা একতা বজায় রাখুন। আমি বলেছিলাম, 'বাংলাদেশকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাল্লাহ' বাংলাদেশ আজ মুক্ত স্বাধীন।... বাংলাদেশ ইতিহাসে স্বাধীন দেশরূপেই বেঁচে থাকবে।" তাছাড়া বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলার রূপরেখা প্রতিধ্বনিত হয় ১৯৭২-এর ২৬ মার্চের প্রথম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে তাঁর বেতার ও টিভি ভাষণে, "আমার সরকার অভ্যন্তরীণ সমাজবিপ্লবে বিশ্বাস করে। এটা কোনো অগণতান্ত্রিক কথামাত্র নয়। আমার সরকার ও পার্টি বৈজ্ঞানিক সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি প্রতিষ্ঠা করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। একটি নতুন ব্যবস্থার ভিত রচনার জন্য পুরাতন সমাজব্যবস্থা উপড়ে ফেলতে হবে। আমরা শোষণমুক্ত সমাজ গড়বো।" আর এ কথার প্রতিফলন লক্ষ করা যায়, ১৯৭২-এর বাংলাদেশ সংবিধানের প্রস্তাবনায়, যেখানে উপস্থাপিত হয়েছে "আমরা আরও অঙ্গীকার করিতেছে যে, "আমাদের রাষ্ট্রের অন্যতম মূল লক্ষ্য হইবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এমন এক শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজের প্রতিষ্ঠা যেখানে সকল নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য, স্বাধীনতা ও সুবিচার নিশ্চিত হইবে।" গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের প্রতিটি ভাগ ও অনুচ্ছেদের সম্মিলিত বর্ণনাই যেন সোনার বাংলা বিনির্মাণ এবং টেকসই উন্নয়নের রূপরেখা।

বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক ও উন্নয়ন দর্শন

জাতির পিতার আদর্শিক রাজনৈতিক জীবনদর্শন এবং উন্নয়নদর্শন পর্যালোচনা করলেই বাংলাদেশ সৃষ্টি এবং সোনার বাংলা বিনির্মাণ রূপকল্পে উন্নয়নের সূচনা-কথা উন্মোচিত হবে। এই মহান নেতার জীবন দর্শন পর্যালোচনা করলে কতগুলো মূল দর্শন প্রতিভাত হবে। সবার ঊর্ধ্বে মানুষের অবস্থান, নৈতিক ও ন্যায়বোধ বিচারে সকল মানুষের সমতা এবং কেবল মানুষই ইতিহাস গড়তে পারে এমন দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি। আর রাজনৈতিক দর্শন পর্যালোচনা করলে তাঁর এ দৃষ্টিভঙ্গির মূল দর্শন প্রতিভাত হবে- শোষণ, বঞ্চনা ও বৈষম্যমুক্ত সমাজ বিনির্মাণ, রাষ্ট্রকাঠামোর মূলনীতি হবে জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা এবং জনগণই প্রজাতন্ত্রের মালিক। এবারে তাঁর সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন দর্শন পর্যালোচনা করলে একথা স্পষ্ট হবে যে, তিনি বৈষম্যহীন অর্থনীতি, সমাজনীতি ও অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ বিনির্মাণে আলোকিত মানুষের সমৃদ্ধ জ্ঞানভিত্তিক সমাজ সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন। বাংলাদেশের উন্নয়ন সূচনা এই মহান নেতার নেতৃত্বেই ঘটেছিল। বাংলাদেশের উন্নয়ন সোপান বলতে স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম সময় থেকেই শুরু করতে হবে। মাত্র সাড়ে তিন বছরের শাসনকালে জাতির পিতা দেশের উন্নয়নের শক্ত ভিত্তি তৈরিতে বহু পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। আজকের বাংলাদেশের উন্নয়নের মহাসড়কের যাত্রা, মধ্যম আয়ের দেশের পথে যাত্রার মূল ভিত্তি জাতির পিতার সাড়ে তিন বছরের সময়কালে নির্মিত উন্নয়ন সোপান।

বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা বিনির্মাণ সোপান ও উন্নয়ন পদক্ষেপ

জাতির পিতার সোনার বাংলা গড়ার উন্নয়ন সোপানে পরিকল্পনা কমিশন গঠন এবং প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন (১৯৭৩-৭৮) উল্লেখযোগ্য দুটি পদক্ষেপ। এই পদক্ষেপ দুটির মূল লক্ষ্য ছিল সুষম উন্নয়ন এবং সম্পদের সামাজিকীকরণ। পরিকল্পনা কমিশনের চেয়ারম্যান হিসেবে ওই দলিলের মুখবন্ধে প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান লিখলেন, '... a plan for reconstruction and development of the economy taking into account the inescapable political, social and economic realities of Bangladesh'। এ দলিলের মুখবন্ধে আরও লিখলেন, 'এ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ভবিষ্যৎ বিকাশের দিকনির্দেশনা এবং উন্নয়নে অগ্রাধিকার চিহ্নিত করার উদ্দেশ্যে স্বল্প সময়ে প্রণয়ন করা হয়েছে। ...জাতি গঠনে আমাদের সবাইকে একাগ্রচিত্তে ত্যাগস্বীকার করতে হবে যেমনটি মুক্তিযুদ্ধে আমরা সাহস ও উদ্দীপনাসহ করেছিলাম।' প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের পুনর্গঠন বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হলেও মূল দিকনির্দেশনা ছিল আগামীর সমৃদ্ধ বাংলাদেশ। দারিদ্র্য নিরসন প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। লক্ষ্য অর্জনের কৌশল হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছিল কর্মের সুযোগ বৃদ্ধি, জাতীয় আয় বৃদ্ধি এবং সমবণ্টন নিশ্চিত করার জন্য কার্যকর আর্থিক ও দ্রব্যমূল্য বিষয়ক নীতিমালা প্রণয়ন। এ দলিলে আরও কতগুলো দিকনির্দেশনা রয়েছে– অর্থনীতির প্রতিটি খাতে, বিশেষত কৃষি ও শিল্পের পুনর্গঠন এবং উৎপাদন বৃদ্ধি করা; সামষ্টিক অর্থনীতির বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার ৩ শতাংশ থেকে কমপক্ষে ৫.৫ শতাংশ উন্নীত করা; আনুষ্ঠানিক খাতসমূহে কর্মসংস্থান বৃদ্ধির পাশাপাশি উন্নয়নে স্বেচ্ছাশ্রমের বৃদ্ধি, মানবসম্পদ ও অর্থনৈতিক সম্পদের সর্বাধিক বিকাশের লক্ষ্যে উন্নয়নমুখী স্থানীয় সরকার কাঠামো শক্তিশালী করা; নিত্যপ্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং এসবের বাজারমূল্য দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে রাখা; বৈদেশিক সাহায্যের ওপর নির্ভরশীলতা কমানো, গ্রাম ও শহরে স্বকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, কৃষির প্রাতিষ্ঠানিক ও প্রযুক্তিগত পরিবর্তন, খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন এবং শিক্ষা, স্বাস্থ্য, গ্রামীণ গৃহায়ন, পানি সরবরাহ ও মানবসম্পদ উন্নয়ন খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি করা। এখানে উল্লেখ্য, বিজয়ের এক বছরের মধ্যেই জাতির পিতা খাতওয়ারি ক্ষয়-ক্ষতি নির্ধারণ করে অগ্রাধিকারভিত্তিতে বহু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন পদক্ষেপগুলোর মধ্যে তাঁর উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম হলো– শরণার্থী পুনর্বাসন ও দেশের অভ্যন্তরে ৪৩ লক্ষ বাসগৃহ পুনর্নির্মাণে ত্রাণ কমিটির রূপরেখা প্রণয়ন, মুক্তিযোদ্ধাদের পুনর্বাসন, শহিদ ও আহত মুক্তিযোদ্ধাদের

পুনর্বাসন, পরিকল্পনা কমিশন গঠন, প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন, ধ্বংসপ্রাপ্ত যোগাযোগ ব্যবস্থা পুনর্গঠন ও পুনর্নির্মাণ, কৃষিপুনর্বাসন, টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা চালু করা, প্রশাসনিক কাঠামো পুনর্বিন্যাস, আন্তর্জাতিক অনুদান প্রাপ্তির কূটনীতি, ব্যাংক, বীমা, পাট, বস্ত্রকল জাতীয়করণ, বিদ্যুৎ উৎপাদন কার্যক্রম, ১৯৭১-এর মার্চ-ডিসেম্বরকালীন ছাত্রবেতন মওকুফ, প্রাথমিক স্কুল জাতীয়করণ, কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশন গঠন, পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন ও বিতরণের ঘোষণা, বাজেটে শিক্ষাখাতে সর্বোচ্চ বরাদ্দ, ধ্বংসপ্রাপ্ত স্কুল কলেজে নির্মাণসামগ্রী সরবরাহ, শিক্ষকদের ৯ মাসের বকেয়া বেতন দেয়া, জরুরিভাবে ১৫০টি আইন প্রণয়ন, কৃষকদের (২৫ বিঘা পর্যন্ত) খাজনা মওকুফ, কৃষকদের কৃষি উপকরণ সরবরাহ প্রভৃতি। তাঁর উন্নয়ন পদক্ষেপের পরবর্তী আড়াই বছরে প্রশাসনিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায় ব্যাপক সংস্কার সাধনসহ বহু উন্নয়ন কার্যক্রমের সূত্রপাত ঘটিয়েছিলেন।

বিশ্ববাজারে রাসায়নিক সারের ব্যাপক মূল্য বৃদ্ধির হাত থেকে কৃষককে বাঁচাতে বঙ্গবন্ধুর সরকার ব্যাপক ভর্তুকি প্রদান করে। এ সময়ে তিনি কৃষিখাতে ব্যাপক সংস্কার করেন। তাঁর সরকার কর্তৃক কৃষকদের বিরুদ্ধে পাকিস্তান আমলের সকল সার্টিফিকেট মামলা প্রত্যাহার, সুদসহ কৃষি ঋণ মওকুফ, খাজনা মাফ, খাসজমি পুনর্বণ্টন, অধিক পরিমাণে গঙ্গার পানি প্রাপ্তি, ঋণ সালিশী আইন, সকল বন্ধকি ও চুক্তি কবলা জমি ৭ বছর ভোগ করার পর মালিকের তা ফেরত দেয়ার বিধান, পল্লী বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড প্রতিষ্ঠা এবং অন্যান্য কৃষকবান্ধব নীতি প্রণয়নের ফলে বাংলাদেশে তখন থেকেই একটি শক্তিশালী কৃষি খাতের সৃষ্টি হয়। আর কৃষি বিপ্লবে এই মহান নেতার ভূমিকার ভিত্তিই আজকের বিজ্ঞানভিত্তিক কৃষি বিপ্লব।

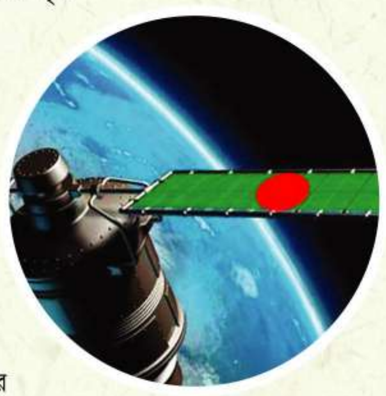

উল্টোপথে বাংলাদেশের উন্নয়নের চাকা

পাঁচ বছরের জন্য যে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (১৯৭৩-৭৮) দলিল প্রণীত হলো তা বাস্তবায়নের দুবছরের মধ্যে গভীর এক আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট একদল ঘাতক-খুনি চক্র অত্যন্ত নির্মম-নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ পরিবার-পরিজনকে। এ হত্যার মধ্যদিয়ে রুদ্ধ করা হলো একটি জাতির সুষম পথচলা ও অগ্রগতিকে। এ হত্যা একটি জাতির ভবিষ্যৎ উন্নয়নের পথকে কণ্টকাকীর্ণ করার ঘৃণ্য পদক্ষেপ। উল্টো রথে চলার এ যাত্রার সময়কাল বিস্তৃত দীর্ঘ ২১ বছর। এরপর প্রণীত হয় দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৭৮-৮০), দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৮০-৮৫), তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৮৫-৯০) এবং চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৯০-৯৫)। পরিকল্পনাসমূহে উন্নয়নের দিকনির্দেশনা থাকলেও জাতির পিতার শোষণহীন-বঞ্চনাহীন-বৈষম্যহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা, দুঃখী-আর্ত মানুষের ন্যায্য হিস্যা নিশ্চিতকরণে কোনো কার্যক্রম এ পরিকল্পনাগুলোর বাস্তবায়নে চোখে পড়েনি। গুটিকতক মানুষের স্বার্থ পূরণ হলো এ ২১ বছরে। ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য প্রকট হলো, সৃষ্টি হলো ভুঁইফোড় পুঁজিপতি এবং সমাজ ও রাষ্ট্রীয়জীবনে অন্যায়, শোষণ, অনাচার ও অবিচার বেড়ে গেল।

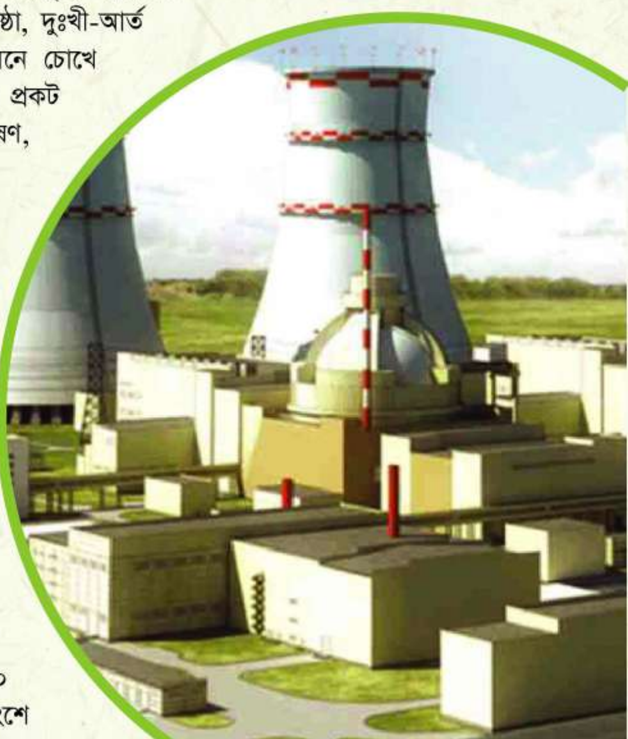

সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়ে বর্তমান সরকারের উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং টেকসই উন্নয়ন পদক্ষেপ

২১ বছর পর ১৯৯৬ সালে নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করে। জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার দারিদ্র্য বিমোচন, মৌলিক মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা, ন্যায় ও সমতা প্রতিষ্ঠার মূলমন্ত্র নিয়ে বহু উদ্যোগ গ্রহণ করে। এ সময়কালে পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৯৭-২০০২) দলিল প্রণয়ন করা হয় এবং এ পরিকল্পনা অনুযায়ী উন্নয়নের রূপরেখা তৈরি করে বহু কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়। ১৯৯৬ হতে ২০০১ সাল এ পাঁচবছর মেয়াদে শেখ হাসিনার সরকার সকল ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব অগ্রগতি অর্জন করে। এ সময়কালে খাদ্যে স্বনির্ভরশীলতা অর্জন করে বাংলাদেশ। দ্রব্যমূল্য জনগণের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে ফিরে আসে। মূল্যস্ফীতির হার ১.৫৯ শতাংশে নেমে আসে এবং প্রবৃদ্ধির হার ৬.২ শতাংশে উন্নীত হয়। দারিদ্র্য বিমোচনে উদ্ভাবনমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করায় দারিদ্র্য হ্রাসের বার্ষিক গড় হার ০.৫০ শতাংশ থেকে ১.৫০ শতাংশে উন্নীত হয় এবং দারিদ্র্য সূচক ৪১.৬ থেকে ৩২ শতাংশে নেমে আসে। মানব উন্নয়ন সূচকে জাতিসংঘের ৫৬ পয়েন্ট অর্জন ও সাক্ষরতার হার ৬৫ শতাংশে উন্নীত হয়।

এ মেয়াদে (১৯৯৬-২০০১) শেখ হাসিনা সরকারের অনন্য উল্লেখযোগ্য সাফল্যগাঁথায় সংযোজিত

শান্তি চুক্তি; যমুনা নদীর ওপর বঙ্গবন্ধু সেতু নির্মাণ; ২১ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের মর্যাদা অর্জন; জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের সদস্যপদ লাভ; ডি-৮ এবং বিমসটেক প্রভৃতি উপআঞ্চলিক সহযোগিতা ফোরাম গঠনে অগ্রণী ভূমিকা পালন এবং এসোসিয়েশন ফর পার্লামেন্টারিয়ান্স ফর পিস (এএপিপি) গঠন। তাছাড়া, কৃষকদের জন্য বিভিন্ন কল্যাণমূলক কর্মসূচি এবং ভূমিহীন, দুঃস্থ মানুষের জন্য সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচি চালু করা হয় এ সময়কালে। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: দুঃস্থ মহিলা ও বিধবা ভাতা; প্রতিবন্ধী ভাতা; মুক্তিযোদ্ধা ভাতা, আশ্রয়হীনদের জন্য আশ্রয়ণ প্রকল্প, একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দ্বিতীয়বারের মতো প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন ২০০৯ হতে ২০১৩ পর্যন্ত। এই পাঁচ বছর মেয়াদের ধারাবাহিকতায় ২০১৪-২০১৮ এবং ২০১৯-২০২৩ টানা দশ বছরের উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় এ দেশের উন্নয়নে ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়। এই দশ বছরের উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনার মূল লক্ষ্য ছিল দারিদ্র্যমুক্ত ও বৈষম্যহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা। আর এ লক্ষ্য পূরণে তিনি দেশের সামষ্টিক ও পরিকল্পিত উন্নয়নের ওপর জোর দিয়েছেন। তাঁর নেতৃত্বাধীন সরকার ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, এমডিজি, সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, রূপকল্প-২০২১-এর ভিত্তিতে প্রণীত প্রথম প্রেক্ষিত পরিকল্পনা, রূপকল্প-২০৪১ এবং ব-দ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০ প্রণয়ন ও এর যথাযথ বাস্তবায়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ফলে ২০০৯ থেকে শুরু করে বিগত দশ বছরে বাংলাদেশের অগ্রযাত্রা কেবল শক্তিশালী নয় তা হয়েছে সুষম ও জনকল্যাণমুখী। বিগত দশ বছরে উন্নয়নশীল অর্থনীতির গড় প্রবৃদ্ধি যখন ৫.১ শতাংশ তখন বাংলাদেশের গড় প্রবৃদ্ধির হার হচ্ছে ৬.৬ শতাংশ। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধি ৮.১৫%-এ উন্নীত হয়েছে যা বাংলাদেশের ইতিহাসে সর্বোচ্চ। মাথাপিছু আয় ২০০৯ সালে ছিল ৭৫৯ মার্কিন ডলার, যা বেড়ে ২০১৯ সালে হয়েছে ১ হাজার ৯০৯ মার্কিন ডলার। দশ বছরে বাজেটের আয়তন বেড়েছে ৮৯ হাজার কোটি টাকা থেকে ৫ লাখ ২৩ হাজার কোটি টাকায়। দেশে সরকারি বিনিয়োগ ২০০৯ সালে ছিল ৪.৩ শতাংশ, যা বেড়ে ২০১৮ সালে হয়েছে ৮.২ শতাংশে।

বর্তমান সরকারের রপ্তানিমুখী ব্যবসার সম্প্রসারণ ও বিনিয়োগ-বান্ধব উন্নততর পরিবেশ সৃষ্টির কারণে একদিকে যেমন দেশীয় শিল্প বিকশিত হচ্ছে অন্যদিকে রপ্তানি আয় ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ব্যবসাবান্ধব রপ্তানি নীতি গ্রহণের ফলে বর্তমানে বাংলাদেশের ৭৪৪টি পণ্য ১৯৬টি গন্তব্যে রপ্তানি হচ্ছে এবং দেশের বার্ষিক রপ্তানির পরিমাণ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বেড়ে হয়েছে ৪০.৫৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০০৯ হতে ২০১৮ সালের মধ্যে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ৭.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩২.৭২ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে। একই সাথে, সর্বজনীন শিক্ষা, জনমুখী স্বাস্থ্যসেবা ও পরিবারকল্যাণ কার্যক্রম, লক্ষ্যাভিমুখী সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি, কর্মসংস্থান, উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ও সচেতনতামূলক কার্যক্রমের সম্প্রসারণ ও বিকেন্দ্রায়নসহ সার্বিক অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন কৌশল অনুসরণের ফলে সামাজিক খাতে বিগত দশ বছরে অভূতপূর্ব অগ্রগতি হয়েছে। ফলে দারিদ্র্যের হার ২০১০ সালের ৩১.৫ শতাংশ থেকে বর্তমানে ২১.৮ শতাংশে এবং অতি-দারিদ্র্যের হার ১৭.৬ শতাংশ থেকে ১১.৩ শতাংশে নেমে এসেছে।

মধ্যম আয়ের অভিযাত্রার এক নজরে বাংলাদেশের সূচক পরিস্থিতি

মধ্যম আয়ের দেশে পথযাত্রায় গত দশ বছরে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অগ্রগতির সংক্ষিপ্ত সার নিচের ছকে উপস্থাপন করা হলো। সারণিতে ২০০৫-২০০৬ সালের তথ্যও উপস্থাপিত হয়েছে।

এতে দুটি সরকারের উন্নয়ন যাত্রাপথের তুলনা করা যায়।

সারণি: ১: বিভিন্ন সূচকের ভিত্তিতে ২০০৫-২০০৬ থেকে ২০১৮-২০১৯ বাংলাদেশের অগ্রগতি চিত্র

ক্রমিক	সূচকসমূহ	২০০৫-২০০৬	২০০৯-২০১০	২০১৮-২০১৯
১.	মাথাপিছু আয়	৫৪৩ মার্কিন ডলার	৮৪৩ মার্কিন ডলার	১৯০৯ মার্কিন ডলার
২.	দারিদ্র্য	৪১.৫%	৩৩.৪% (২০০৯)	২১.৮%
৩.	প্রবৃদ্ধির হার	৫.৪০%	৫.৫৭%	৮.১৫%
৪.	জিডিপি'র আকার	৪৮২৩৩৭ কোটি টাকা	৬৯৪৩২০ কোটি টাকা	২০,০০০০০ কোটি টাকা
৫.	রপ্তানি	১০.৫ বি.মা.ড.	১৬.২১ বি.মা.ড.	৪০.৫৩ বি.মা.ড.
৬.	রিজার্ভ	৩.৪৮ বি.মা.ড	১০.৭৫০ বি.মা.ড	৩২.৭২বি.মা.ড. (সর্বোচ্চ)

৭.	মুদ্রাস্ফীতি	৭.১৬%	৭.৩১%	৫.৫১ (জুলাই ২০১৮ পর্যন্ত)
৮.	বৈদেশিক বিনিয়োগ	০.৭৪৪ বি.মা.ড.	০.৭০০ বি.মা.ড.	প্রায় ৩ বি.মা.ড.
৯.	বাজেট	৬১,০৫৭ কোটি টাকা	১,১৪,০০০ কোটি টাকা	৪,৬৪,৫৭৩ কোটি টাকা
১০.	এডিপি	১৯০০০ কোটি টাকা	৩০৫০০ কোটি টাকা	১,৭৩,০০০ কোটি টাকা
১১.	বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা	৪৯০০ মেগাওয়াট	৪৯৪২ মেগাওয়াট	২০,০০০ মেগাওয়াট
১২.	দানাদার শস্য উৎপাদন	১৮০০০০০০ মেট্রিক টন	৩৪১১৩০০০ মেট্রিক টন	৪২০০০০০০ মেট্রিক টন
১৩.	শিশু মৃত্যু হার (প্রতি হাজারে)	৫০ (২০০৫)	৩৯ (২০০৯)	২২ (২০১৮)
১৪.	মাতৃমৃত্যু হার (প্রতি হাজারে)	৩.৪৮ (২০০৫)	২.৫৯ (২০০৯)	১.৬৯ (২০১৮)

বিগত দশ বছরে কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অবকাঠামো উন্নয়নসহ আর্থ-সামাজিক প্রায় সকল সূচকে বাংলাদেশ অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করেছে। অনেক ক্ষেত্রে বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার প্রতিবেশী দেশকেও ছাড়িয়ে গেছে। স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় পাকিস্তানি বাহিনী এদেশের অর্থনৈতিক কাঠামো সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দেয়। ধ্বংসস্তূপের মধ্য হতে বাংলাদেশ আজ নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হয়েছে। বিশেষ করে ২০০৯ সালের পর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দক্ষ ও গতিশীল নেতৃত্বের কারণে বাংলাদেশ বিভিন্ন ক্ষেত্রে অর্জন করেছে অভূতপূর্ব সাফল্য।

বাংলাদেশের অগ্রগতি ও সাফল্যের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে বাংলাদেশ বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে অগ্রগতির স্বাক্ষর রেখেছে তার ফলে এসেছে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি। জাতিসংঘের সাবেক মহাসচিব বান-কি-মুন এবং বর্তমান মহাসচিব অ্যান্টোনিও গুতারেস বিশ্বে বাংলাদেশকে 'উন্নয়নের রোল মডেল' হিসেবে অভিহিত করেন। বাংলাদেশের উন্নয়ন সম্পর্কে সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা ২০১৫ সালে তার নিজ পিতৃভূমি কেনিয়া সফরকালে সে দেশের উন্নয়নে 'বাংলাদেশের উন্নয়ন মডেলকে' অনুসরণ করতে জোর সুপারিশ করেন। তাছাড়া সাম্প্রতিক পাকিস্তানের একজন সাংবাদিক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানকে পাকিস্তানের উন্নয়নের জন্য 'বাংলাদেশের উন্নয়ন মডেল' অনুসরণ করতে বলেন। বাংলাদেশের এই উন্নয়নের পেছনে রয়েছে বিগত ১০ বছরের নেতৃত্বদানকারী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্ব, জনগণের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা, দেশপ্রেম এবং নিরলস পরিশ্রম।

আর্থ-সামাজিক সক্ষমতা অর্জনের ক্ষেত্রে আজকের বাংলাদেশ যেন এক বদলে যাওয়া বাংলাদেশ। এই উন্নয়ন অভিযাত্রায় বাংলাদেশ ইতোমধ্যে মানের দিক থেকে দু'টি বিশেষ বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছে, ২০১৫ সালে বিশ্বব্যাংক বাংলাদেশকে নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশের স্বীকৃতি প্রদান করেছে এবং ২০১৮ সালের মার্চ মাসে জাতিসংঘ বাংলাদেশকে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের প্রাথমিক বিবেচনায় উত্তীর্ণ ঘোষণা দেয়। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, জিডিপি (Nominal)-এর ভিত্তিতে বর্তমানে বাংলাদেশ পৃথিবীর ৩৯তম বৃহৎ অর্থনীতির দেশ আর ক্রয়ক্ষমতা সমতার (purchasing power parity) ভিত্তিতে আমাদের অবস্থান ২৯তম। এছাড়া আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের তথ্যমতে ২০১৯ সালে বিশ্বের সব দেশের মধ্যে তৃতীয় সর্বোচ্চ প্রবৃদ্ধি হবে বাংলাদেশে। Price Waterhouse Coopers-এর প্রক্ষেপণ অনুযায়ী ২০৩০ সাল নাগাদ বাংলাদেশ হবে বিশ্বের ২৮তম বৃহত্তম অর্থনীতি এবং ২০৫০ সালে বাংলাদেশের অবস্থান হবে ২৩তম।

আমাদের এই বাংলাদেশ আয়তনের দিক হতে বিশ্বের ৯৪তম দেশ হলেও বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অসামান্য অর্জন রয়েছে। বাংলাদেশ আজ ইলিশ উৎপাদনে বিশ্বে ১ম স্থান অর্জন করেছে। তৈরী পোশাক রপ্তানিতে ২য় স্থান, পাট উৎপাদনে ২য় স্থান, শাকসবজি উৎপাদনে ৩য়, মাছ উৎপাদনে ৩য়, ছাগল উৎপাদনে ৪র্থ, চাল উৎপাদনে ৪র্থ, আলু উৎপাদনে ৭ম, আম উৎপাদনে ৮ম, চা উৎপাদনে ৯ম এবং ফল উৎপাদনে ১০ম স্থান অর্জন করেছে। ছোট্ট আয়তনের এই দেশের যদি এতগুলো অর্জন সম্ভব হয়, তাহলে আমরা বিশ্বাস করতে পারি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সুযোগ্য নেতৃত্ব ও আমাদের সকলের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টায় বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা বা ২০৪১-এর উন্নত বাংলাদেশ গঠন সম্ভব হবে। ■

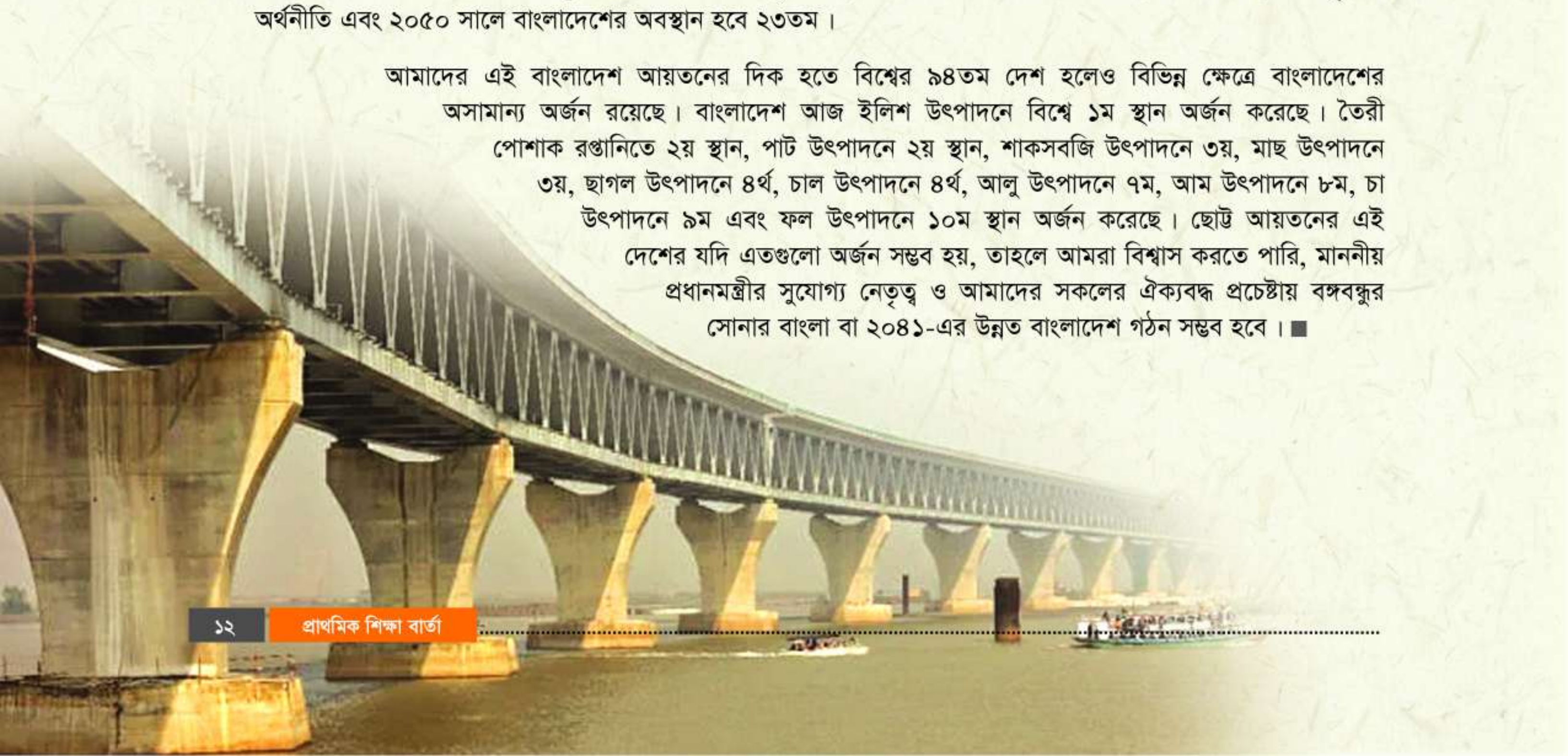

কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম

মোঃ আব্দুস সালাম
প্রোগ্রাম অফিসার
বাংলাদেশ কোভিড-১৯ স্কুল সেক্টর রেসপন্স প্রকল্প
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

মুহাম্মদ ফজলে এলাহী
গবেষণা কর্মকর্তা, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর ও
প্রোগ্রাম অফিসার (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
বাংলাদেশ কোভিড-১৯ স্কুল সেক্টর রেসপন্স প্রকল্প

সামাজিক, জাতীয় কিংবা বৈশ্বিক উন্নয়নের মূল অনুষঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা, এটি শিক্ষার পরবর্তী সকল স্তরের ভিত্তি। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর প্রাথমিক শিক্ষায় যুগান্তকারী ভূমিকা পালন করে আসছে, যা বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত ও সমাদৃত। এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা পূরণ ও সরকারের গৃহীত রূপকল্প বাস্তবায়নে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর দৃপ্ত প্রত্যয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু করোনা ভাইরাস মহামারি বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো আমাদের দেশের শিক্ষা-কার্যক্রমকেও থমকে দেয়। ২০২০ সালের ৮ মার্চ দেশে প্রথম করোনা ভাইরাস শনাক্ত হলেও ১৮ মার্চ থেকে সমগ্র দেশে সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা করা হয়। ঐ পরিস্থিতিতে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর দেশের প্রাথমিক শিক্ষার পাঠদান কার্যক্রম বিকল্প উপায়ে অব্যাহত রাখার জন্য বিবিধ পরিকল্পনা গ্রহণ এবং তা বাস্তবায়নে নিম্নোক্ত নানামুখী উদ্যোগ গ্রহণ করে।

- কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে লকডাউন ও বিদ্যালয় বন্ধের সময় শিক্ষার্থীদের পাঠচর্চা ও পাঠে মনোযোগী রাখার লক্ষ্যে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর ২০২০ সালের ৭ এপ্রিল থেকে সংসদ বাংলাদেশ টেলিভিশনের মাধ্যমে "ঘরে বসে শিখি" পাঠ-সম্প্রচার কার্যক্রম পরিচালনা শুরু করে।
- প্রত্যন্ত অঞ্চলের অনেক শিক্ষার্থী যাদের কাছে টেলিভিশন কিংবা ইন্টারনেট সুবিধা নেই তারাও যেন নিজেকে সুরক্ষিত রেখে ঘরে বসে পড়াশুনা চালিয়ে যেতে পারে সেলক্ষ্যে ১২ সেপ্টেম্বর ২০২০ থেকে বাংলাদেশ বেতার ও কমিউনিটি রেডিওর মাধ্যমে পাঠসম্প্রচার কার্যক্রম চালু হয়।
- সারাদেশে গুগলমিট ব্যবহার করে অনলাইনে পাঠদান কার্যক্রম পরিচালনা শুরু হয়। এ কার্যক্রম গতিশীল এবং অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে ক্লাস্টারভিত্তিক আইসিটি পুল গঠন করা হয়। আইসিটি পুল সদস্যরা গুগলমিট ব্যবহারের ওপর শিক্ষকদের একদিনের ওরিয়েন্টেশন প্রদান করছেন এবং ওরিয়েন্টেশনপ্রাপ্ত শিক্ষকগণ অভিভাবকদের (যাদের স্মার্টফোন রয়েছে) ওরিয়েন্টেড করেন।
- করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) বৈশ্বিক মহামারিতে আক্রান্ত, সুস্থ এবং মৃত্যুবরণকারী প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরাধীন কর্মকর্তা-কর্মচারী, শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের অনলাইন ডাটাবেজ উন্নয়ন ও তথ্য হালনাগাদকরণে চালু করা হয় 'করোনা তথ্য বাতায়ন'। এটি এমন এক অনলাইন পোর্টাল যেখানে কোভিড-১৯-এ আক্রান্ত প্রাথমিক শিক্ষা পরিবারের কর্মকর্তা, কর্মচারী, শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীর বর্তমান স্ট্যাটাস জানা যায়, হটলাইনে যোগাযোগ করে পাওয়া যায় প্রয়োজনীয় সহায়তা। এখানে সন্নিবেশিত আছে পাঠদান অব্যাহত রাখার জন্য গৃহীত সকল উদ্যোগ, সন্নিবেশিত আছে কোভিড-১৯ পরিস্থিতি মোকাবেলায় জারিকৃত সকল নির্দেশনা, সম্প্রচারিত পাঠ এবং সুরক্ষা-সংশ্লিষ্ট সকল ভিডিও। একক মন্ত্রণালয় হিসেবে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ই প্রথমবারের মতো এমন একটি ওয়েবপোর্টাল ডেভেলপ করেছে, যেখানে কোভিড-১৯ সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় সকল তথ্য এবং গৃহীত উদ্যোগগুলো ইন্টিগ্রেটেড ওয়েতে সন্নিবেশিত করা হয়।

- শিক্ষকগণ শিক্ষার্থীদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রেখে ইউনিসেফ ও এটুআই-এর সহায়তায় 'ঘরে বসে শিখি' ডিজিটাল/অনলাইন ক্লাসে অংশ গ্রহণের জন্য অভিভাবক ও শিক্ষার্থীদের উদ্বুদ্ধ করেন, বাড়ির কাজের খোঁজ খবর রাখেন এবং সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করেন।
- কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে পাঠদান অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ) কর্তৃক প্রণীত শিক্ষার্থীদের শিখন-ঘাটতি চিহ্নিতকরণ ও নিরাময়যোগ্য পাঠপরিকল্পনা (Accelerated Remedial learning Plan) অনুসারে প্রথম শ্রেণি থেকে পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের বাড়ির কাজ ও ওয়ার্কশিট বিতরণ করে নিয়মিত পাঠদান চলমান রাখা

হয়, যা কোভিডকালীন পরিস্থিতিতে শিক্ষার্থীদের পাঠদান কার্যক্রম চলমান রাখতে নতুন মাত্রা যোগ করে।

- প্রাথমিক শিক্ষা উপবৃত্তি প্রকল্প (তৃতীয় পর্যায়)-এর আওতায় এপ্রিল ২০২০ হতে জুন ২০২০ পর্যন্ত আর্থিকভাবে অসচ্ছল শিক্ষার্থীদের মায়েদের/অভিভাবকদের মোবাইল একাউন্টের মাধ্যমে কিট এলাউন্স ও উপবৃত্তি বাবদ ৩৩০৪,৩৭,৮৯,৭২৫.০০ টাকা পৌঁছে দেওয়া হয়।
- স্কুল ফিডিং কর্মসূচির আওতায় দারিদ্র্যপীড়িত ১০৪ (সরকারি অর্থায়নে ৯৪টি এবং WFP অর্থায়নে ১০টি) উপজেলায় জানুয়ারি ২০২০ হতে ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত ৬২,৭৩৫ (বাষট্টি হাজার সাতশত পঁয়ত্রিশ) মেট্রিক টন পুষ্টিসমৃদ্ধ বিস্কুট শিক্ষার্থীদের বাড়িতে পৌঁছে দেওয়া হয়।
- করোনা পরিস্থিতি মোকাবেলায় উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত (ট্যাগ অফিসার) কর্মকর্তাগণের কর্মস্থলে উপস্থিত থেকে দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন নিশ্চিত করা হয়।
- School Reopening Plan প্রস্তুত করা হয়। Plan-এ বিদ্যালয়ের পরিবেশ, শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্যগত নিরাপত্তা, অভিভাবকদের সচেতনতা, কমিউনিটির সম্পৃক্ততা ও শিক্ষকদের প্রস্তুতিসহ সার্বিক বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়।
- সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী ও শিক্ষকের বৈশাখী ভাতার ২৪ কোটি ৩৯ লক্ষ টাকা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিলে প্রদান করা হয়।
- করোনাকালীন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবকদের মধ্যে যাদের মোবাইল ফোন নেই, স্থানীয়ভাবে তাদের মোবাইল ফোন দেয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। ইতোমধ্যে ব্যক্তিগত উদ্যোগে খুলনার জেলা প্রশাসক ৪৭৫জন অভিভাবককে মোবাইল ফোন প্রদান করেন।
- 'আসবেই আলো আসবে সুদিন' শিরোনামে প্রাথমিক শিক্ষা সাংস্কৃতিক মঞ্চ-এর কথা ও সুরে মঞ্চের শিল্পীদের গাওয়া সংগীত সকল মাধ্যমে প্রচার হয়। এটি করোনা মোকাবেলায় সচেতন করে সকলকে মনোবলে বলীয়ান হতে উদ্বুদ্ধ করে।
- কোভিড-১৯ সংক্রমণের দ্বিতীয় ঢেউ মোকাবেলায় প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর এবং মাঠপর্যায়ের সকল দপ্তরে "মাস্ক ব্যবহার ব্যতীত প্রবেশ নিষেধ/No Mask, No Entry", "মাস্ক ব্যতীত সেবা নিষেধ/No Mask, No Service" ইত্যাদি বার্তা উপযুক্ত মাধ্যমে (পোস্টার/স্টিকার/ব্যানার/বিলবোর্ড ইত্যাদি) দৃশ্যমান করাসহ সকল সেবাপ্রদানকারী ও সেবাগ্রহণকারীর মাস্ক পরিধান ও স্বাস্থ্যবিধি প্রতিপালন নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়।
- করোনার তৃতীয় ঢেউ মোকাবেলায় সজাগ ও সর্তক থাকার জন্য ভার্চুয়াল সভায় মাঠপর্যায়ের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী-শিক্ষককে নির্দেশনা প্রদান করা হয়।
- সমসাময়িক কার্যক্রম ও নিকট ভবিষ্যতের সকল কর্মপরিকল্পনায় করোনার চতুর্থ ঢেউ মোকাবেলার বিষয় বিবেচনায় আনা হচ্ছে। স্বাস্থ্যবিধি যথাযথভাবে অনুসরণ করা হচ্ছে কিনা, তা পরিচালক (প্রশাসন)-এর নেতৃত্বে গঠিত "ভিজিল্যান্স টিম" কর্তৃক নিয়মিত পরিবীক্ষণ ও তত্ত্বাবধান কার্যক্রম অনলাইন ও অফলাইনে চলমান রয়েছে।
- প্রচলিত প্রশিক্ষণ ম্যানুয়ালগুলিকে e-learning platform-এ রূপান্তর করা হচ্ছে।
- 'ঘরে বসে শিখি'র তথ্য সংগ্রহের সফট্ওয়্যার প্রস্তুত এবং মনিটরিং কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। সফট্ওয়্যারের মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক ও অভিভাবক-এর তথ্য সংগ্রহ করা হয়। সারাদেশে কতজন অভিভাবক/শিক্ষার্থীর বাসায় টেলিভিশন, ডিশ সংযোগ, স্মার্ট মোবাইল এবং রেডিও আছে ইত্যাদি বিষয়ে সফট্ওয়্যারে সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে রিপোর্ট প্রণয়ন করা হয়।

করোনা সংক্রমণ কমে এলে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও লকডাউন শিথিল করা হয়। ১২ সেপ্টেম্বর ২০২১ থেকে ৫ম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের প্রতিদিন ও অন্যান্য শ্রেণির শিক্ষার্থীদের সপ্তাহে ১/২ দিন বিদ্যালয়ে সরাসরি শ্রেণি-কার্যক্রমে অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়া হয়। কোভিড-১৯ সংক্রান্ত জাতীয় কারিগরি পরামর্শক কমিটির সুপারিশ এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খোলার আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে বিদ্যালয়ের শ্রেণি-কার্যক্রম সংক্ষিপ্ত করা হয়। শিক্ষার্থীদের শিখন-ঘাটতি চিহ্নিতকরণ ও নিরাময়যোগ্য পাঠপরিকল্পনা (Accelerated Remedial learning Plan) অনুসারে শ্রেণি-কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।

এছাড়াও করোনার কারণে শিক্ষায় ঘাটতি পুষিয়ে নিতে গ্লোবাল পার্টনারশিপ ফর এডুকেশন (জিইপি)-এর আর্থিক সহায়তায় বিশ্বব্যাংকের মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকার প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা-কার্যক্রম চালিয়ে নেওয়ার জন্য ১২৮৪০.৮ লক্ষ টাকা

ব্যয়ে "বাংলাদেশ কোভিড-১৯ স্কুল সেক্টর রেসপন্স"(CSSR) শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করে। জুলাই ২০২০ সালে উক্ত প্রকল্প কার্যক্রম শুরু করে। সমাজের আর্থিক ও সামাজিকভাবে পিছিয়ে পড়া সুবিধাবঞ্চিত প্রত্যন্ত এলাকার ছাত্রছাত্রীদের শিখন-ঘাটতি সর্বনিম্ন পর্যায়ে রেখে যেকোনো জরুরি পরিস্থিতিতে শিক্ষা-কার্যক্রম চালিয়ে নেওয়াই এ প্রকল্পের মূল লক্ষ্য। ছাত্রছাত্রীদেরকে কোভিড-১৯ থেকে নিরাপদ রেখে পুনরায় বিদ্যালয়ে আনয়নের জন্য প্রস্তুত করা, শিখন-ঘাটতি সর্বনিম্ন পর্যায়ে রাখার জন্য শিক্ষার্থীদের বাড়িতে রেখেই শিক্ষা-কার্যক্রম চালিয়ে নেওয়া, কোভিড-১৯ ভাইরাস সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করে যথাসম্ভব সকল শিক্ষার্থীদেরকে, বিশেষ করে তৃণমূল পর্যায়ের শিক্ষার্থীদেরকে শিক্ষা ও শিক্ষণ ব্যবস্থার জন্য প্রস্তুত রাখা এ প্রকল্পের অন্যতম প্রাথমিক উদ্দেশ্য। পরে বিদ্যালয় কার্যক্রম নিরাপদভাবে পুনরায় চালু হলে এ-প্রকল্প একটি শক্তিশালী মনিটরিং ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে "সেইফ স্কুল রি-ওপেনিং প্ল্যান" তৈরি এবং শিক্ষার্থীদের মানসিক স্বাস্থ্য শিক্ষণ অবস্থার মূল্যায়ন করে শিক্ষকদের শিক্ষা-কার্যক্রমকে বেগবান করবে। সর্বোপরি এ প্রকল্পের দীর্ঘমেয়াদি উদ্দেশ্য হলো শিক্ষাব্যবস্থায় "ব্লেন্ডেড লার্নিং এপ্রোচ"-এর মাধ্যমে দূরবর্তী শিক্ষণ প্রক্রিয়ার উন্নয়ন করে একটি আদর্শ পরিচালন পদ্ধতির (Standard Operating Procedures) মাধ্যমে ভবিষ্যতে সংকটময় মূহূর্তে মানিয়ে নেয়ার রিকভারি প্ল্যান করা।

প্রাক-প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক স্তরের ২৫ লক্ষ শিক্ষার্থীকে একীভূত দূরশিক্ষণের আওতায় আনা, ৩২.৪০ লক্ষ প্রাক-প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীকে পুনরায় বিদ্যালয়ে আনয়ন নিশ্চিত করা, বিদ্যালয় শিক্ষাব্যবস্থায় দূরশিক্ষণ ব্যবস্থাকে পুরোপুরি কার্যকর করে তোলা, প্রাক-প্রাথমিক থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত পুরো শিক্ষাবর্ষের জন্য বিষয়ভিত্তিক ডিজিটাল কনটেন্ট প্রস্তুত এবং বিস্তরণ করা, প্রত্যন্ত এলাকার ১.৫ লক্ষ শিক্ষার্থীকে শিক্ষা-উপকরণ সরবরাহ করা, বিদ্যালয় বন্ধের বিরূপ প্রতিক্রিয়া কমানোর জন্য ১৫ লক্ষ শিক্ষার্থীর মাঝে 'সংবেদনশীল ক্যাম্পেইন' পরিচালনা করা, ২০,০০০ বিদ্যালয়কে সেইফ স্কুল রি-ওপেনিং-এ সহায়তা করা, শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য ম্যানুয়াল প্রস্তুত করা, বিদ্যালয় বন্ধের কারণে ৩.৫০ লক্ষ ছাত্রছাত্রীর শিক্ষণ-ক্ষতির পরিমাণ নিরূপণ করা, ২,০০০ শিক্ষককে দূরশিক্ষণ, রিমিডিয়াল লার্নিং, ফরমেটিভ ও সামেটিভ মূল্যায়নের ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা– এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য। এ প্রকল্পের আওতায় প্রাথমিক এবং মাধ্যমিকের মোট ৮৮৯৮টি ডিজিটাল কনটেন্ট প্রস্তুত ও বিস্তরণ করা হবে। ইতোমধ্যে এ বিষয়ে ২১ নভেম্বর ২০২১ তারিখে CSSR এবং UNICEF Bangladesh-এর মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ৩ কোটি ৫৯ লক্ষ ছাত্রছাত্রী এ প্রকল্প থেকে সরাসরি উপকৃত হবে। CSSR প্রকল্প ছাড়াও USAID ২০,০০০ এবং UNICEF Bangladesh ৩,০০০ বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্যসুরক্ষা সামগ্রী সরবরাহ করবে।

স্তর	টেলিভিশন	রেডিও	অনলাইন/ওয়েব
প্রাক-প্রাথমিক	৫০	৩০	৬৪
প্রাথমিক	১৩৮৫	৫৪০	১৫১৭
মাধ্যমিক	২৫২৭	৬৬০	২২০৯
মোট	৩৯৬২	১২৩০	৪৪৮০

সারণি : সিএসএসআর প্রকল্পের আওতায় কনটেন্ট ডেভেলপমেন্ট এবং বিস্তরণ পরিকল্পনা

কোভিড-১৯ বাংলাদেশকে প্রযুক্তি সক্ষমতায় কয়েক ধাপ এগিয়ে দিয়েছে। সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশের সুবিধা কাজে লাগিয়ে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর করোনার শুরু থেকেই শিক্ষার্থীদের শিখন-ঘাটতি পুষিয়ে নেওয়ার জন্য নানারকম কার্যক্রম গ্রহণ করে। যার ফলে বর্তমানে প্রাথমিক শিক্ষা আবার স্বাভাবিক হতে শুরু করেছে। আর এ সফলতার পেছনে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় ও প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের আওতাধীন সকল প্রতিষ্ঠান, কর্মকর্তা, কর্মচারীর প্রত্যক্ষ অবদান রয়েছে। করোনাকালীন প্রাথমিক শিক্ষা-কার্যক্রম অব্যাহত রাখার জন্য প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের দেশপ্রেমে উজ্জীবিত সম্মিলিত কর্মপ্রয়াস ও অনবদ্য অবদান বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষার ইতিহাসে ভাস্বর হয়ে থাকবে।■

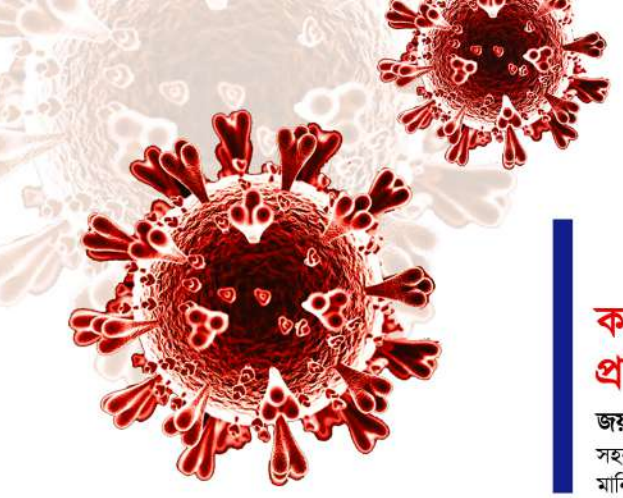

করোনা মহামারি ও প্রাথমিক শিক্ষায় তথ্যপ্রযুক্তি

জয়া রানী সূত্রধর
সহকারী শিক্ষক, পাছবারইল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়
মানিকগঞ্জ সদর, মানিকগঞ্জ

করোনা ভাইরাস বর্তমান বিশ্ববিপর্যয়ের এক অমোঘ সত্য। ২০১৯ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রথম শনাক্ত হওয়া এই অণুজীবটির কারণে দুই বছরেরও অধিক সময় ধরে সমগ্র মানবজাতি মারাত্মক স্বাস্থ্য ও মৃত্যু ঝুঁকিতে পড়েছে। জন্মলগ্ন থেকেই উগ্র বৈশিষ্ট্য ও চরিত্র পরিবর্তনকারী এ ভাইরাস কাঁপিয়ে দিয়েছে বিশ্ব উন্নয়নের ভিত। রাষ্ট্র চালনানীতিতে এসেছে ব্যাপক রদবদল।

করোনাকালে বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা

করোনা মহামারিতে বিশ্বব্যাপী প্রায় ১.৬ বিলিয়ন শিক্ষার্থী তাদের প্রিয় শিক্ষাঙ্গন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। পৃথিবীর ইতিহাসে শিক্ষায় এত বড় আঘাত এটাই প্রথম। শিক্ষার্থীদের জীবন ও স্বাস্থ্য সুরক্ষায় পৃথিবীর অন্য সকল দেশের মতো বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থাকেও সাজাতে হয়েছে বিকল্প পদ্ধতি সামনে রেখে। সরকারি আদেশে ১৮ মার্চ, ২০২০ হতে সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ হওয়ার পর প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, a2i কর্তৃক গৃহীত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপসমূহ হলো:

- প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণি হতে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত বাংলাদেশ সংসদ টেলিভিশন থেকে প্রতিদিন ক্লাস সম্প্রচার;
- বাংলাদেশ বেতার, কমিউনিটি রেডিওতে প্রতিদিন ক্লাস সম্প্রচার;
- ফেসবুক লাইভ ক্লাস, রেকর্ডেড ভিডিও ক্লাস পরিচালনা;
- মোবাইলে পড়া দেয়া-নেয়া ও স্বাস্থ্য সচেতনতা সংক্রান্ত তথ্য প্রদানে যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ;
- ওয়ার্কসিট বিতরণ ও মূল্যায়ন নিশ্চিতকরণ;
- শ্রেণিশিক্ষক কর্তৃক বাড়ি বাড়ি গিয়ে শিক্ষার্থীদের সহায়তা প্রদান।

সরকারি বিভিন্ন উদ্যোগের পাশাপাশি প্রাথমিক শিক্ষকগণ নিজস্ব উদ্যোগ ও অর্থায়নে ফেসবুক, জুম, ম্যাসেঞ্জার, হোয়াটসঅ্যাপ, ইমো ইত্যাদির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদেরকে পাঠে সক্রিয় রাখেন।

২০২১ সালের শুরুতেই প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের নির্দেশনায় গুগলমিট অ্যাপের ব্যবহার পাঠদান কর্মসূচিতে নিয়ে আসে বৈপ্লবিক পরিবর্তন। সহজ পরিচালনা পদ্ধতি, স্বল্পখরচ, স্থায়ীলিংক, আপলোডকৃত লিংক থেকে ক্লাস পরিদর্শনের সুবিধা প্রভৃতি কারণে গুগলমিট খুব দ্রুত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। ২০২১ সালের ১৯ মে আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরুর পর শিক্ষার্থীদের শিখন-ঘাটতি নিরসনে বিদ্যালয়ভিত্তিক রুটিন করে সিডিউল এন্ট্রি দিয়ে প্রতিদিন গুগলমিটে পাঠদান কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের অধীনে মাঠপর্যায়ের জরিপ অনুযায়ী, গ্রামে প্রায় ১০ লাখ এবং শহরে প্রায় ২০ লাখ মোট ৩০ লাখ শিক্ষার্থীকে গুগলমিটে যুক্ত করা সম্ভব হয়, যা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মোট শিক্ষার্থীর প্রায় ১৪ শতাংশ।

প্রযুক্তিনির্ভরতা ও বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষায় এর প্রভাব

বাংলাদেশে করোনা পরিস্থিতির উন্নতি হলে ১২ সেপ্টেম্বর ২০২১ হতে শ্রেণিকক্ষে ফিরে আসে শিক্ষার্থীরা। চলমান ব্লেন্ডেড রুটিনে অফলাইন ক্লাসের পাশাপাশি চালু রাখা হয়েছে অনলাইন ক্লাস। একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, শুধুমাত্র তথ্যপ্রযুক্তির উৎকর্ষের কারণেই একেবারে প্রান্তিক অঞ্চল পর্যন্তও শিক্ষা পৌঁছে দেয়া সম্ভব হচ্ছে। তবে স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের মতে, কোমলমতি শিক্ষার্থীদের ওপর এর বেশ বিরূপ প্রভাব পড়ছে, যা তাদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য মোটেও কল্যাণকর নয়।

ইলেক্ট্রনিক্স ডিভাইস ব্যবহারের সময় উৎপন্ন ইলেক্ট্রো-ম্যাগনেটিক ফিল্ড থেকে শিশুর মস্তিষ্কের বিকাশ ব্যাহত, কোনো কিছু মনে

রাখতে পারার ক্ষমতা হ্রাস, মনোযোগের অভাব, খিটখিটে মেজাজ, অস্থিরতা, বিষণ্ণতা প্রভৃতি জটিলতা তৈরি হয়। বিশিষ্ট চক্ষুরোগ বিশেষজ্ঞ ডা. মোঃ জাফরুল হাসান বলেন, দীর্ঘ সময় মোবাইল ডিভাইস ব্যবহারে শিশুর নিয়ার ভিশনের দূরত্ব কমে যায়। মানসিক স্বাস্থ্যবিশেষজ্ঞ অধ্যাপক মোঃ ওয়াজিউল আলম চৌধুরী বলেন, ডিভাইসের আসক্তির ফলে শিশুর আত্মকেন্দ্রিক ব্যক্তিত্ব, অসামাজিকতা, বিষণ্ণতা ইত্যাদি বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং মানসিক বিকাশের হার উদ্বেগজনক হারে হ্রাস পাচ্ছে।
২০১৯ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি ইউনিসেফ কর্তৃক প্রকাশিত এক রিপোর্টে বলা হয়, বাংলাদেশে ইন্টারনেট ব্যবহারকারী ৩২ শতাংশ শিশু অনলাইন সহিংসতা এবং ডিজিটাল উৎপীড়নের শিকার হওয়ার মত বিপদের মুখে পড়েছে।

অনলাইন শিক্ষাব্যবস্থায় বিবেচ্য দিকসমূহ

ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা বিবেচনায় বাংলাদেশের অবস্থান বিশ্বে নবম। বিটিআরসির সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী ২০২১ সালের মার্চ মাসের শেষে দেশে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা মোট ১১ কোটি ৬১ লাখ ৪০ হাজার। বাংলাদেশে করোনাকালীন ২০২০ সালেই ইন্টারনেট ব্যবহার বেড়েছে অন্তত ৫০ শতাংশ। অনলাইন শিক্ষাপ্রসারে এটি ইতিবাচক সংবাদ হলেও প্রাথমিক স্তরের কোমলমতি শিশুদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য সুরক্ষার বিষয়টি ভুলে গেলে চলবে না। তাই অনলাইন পাঠদানের ক্ষেত্রে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা এখন সময়ের দাবি।

অনলাইন শিক্ষাকার্যক্রমে উল্লেখযোগ্য বিবেচ্য বিষয়সমূহ

- একটানা দীর্ঘসময় শিক্ষার্থীদের অনলাইন ক্লাসে ধরে না রাখা।
- পাঠদান শেষে শিক্ষার্থীর অফলাইনে যাওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করা।
- অবাঞ্ছিত লেকচার পরিহার করে শুধু মৌলিক পাঠের ওপর জোর দেওয়া। এতে করে ক্লাসের দৈর্ঘ্য কমবে। ফলে শিশুরা ডিভাইসের ক্ষতিকর প্রভাব এড়াতে সক্ষম হবে।
- ইন্টারনেট ও ডিভাইসের প্রতি আসক্তি কমাতে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে আনন্দদায়ক উদ্দীপনামূলক চিঠি বিনিময় করতে পারেন। চিঠিতে পাঠ্য বই থেকে ছন্দোবদ্ধ উদ্ধৃতি ব্যবহার করা যেতে পারে, যা পাঠ্য বইয়ের প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে।

- ইন্টারনেটের মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহারের কুফল সম্পর্কে অভিভাবকদের সচেতন করে তোলা।
- ঘরে আবদ্ধ না রেখে শিশুদেরকে মুক্ত পরিবেশ ও সবুজ প্রকৃতির মাঝে কিছু সময়ের জন্য ছেড়ে দেওয়া।
- ইন্টারনেট বা ডিভাইস ব্যবহারকারী শিক্ষার্থীর নিয়মিত কাউন্সিলিং।
- ইলেকট্রনিক্স ডিভাইসসমূহ অভিভাবকের তত্ত্বাবধানে রাখা, শিশুর সাথে জীবনঘনিষ্ঠ গল্প করা, তাদের সাথে ঘরোয়া খেলায় অংশগ্রহণ করা ইত্যাদির মাধ্যমে ইন্টারনেট আসক্তি প্রতিরোধ করা সম্ভব।

প্রযুক্তি বা টেক জায়ান্টরাও এখন তাদের সন্তানদের মেধা ও সৃজনশীলতার বিকাশ ঘটাতে প্রযুক্তিপণ্যের পরিবর্তে বই হাতে তুলে দেয়ার প্রয়োজনীয়তার কথা প্রকাশ করছেন। রোবটিকস প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী পরিচালক ক্রিস আন্ডারসন বলেন, "আমি প্রযুক্তি দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি, আমি চাই না আমার সন্তানদের বেলায় এমনটি হোক।"

উপসংহার

করোনামুক্ত স্বাভাবিক পরিবেশ ফিরে না আসা পর্যন্ত শিক্ষাক্ষেত্রে ইন্টারনেট আমাদের বড় ভরসাস্থল। শুধুমাত্র ইন্টারনেটের পরিমিত ব্যবহারই হতে পারে এর আশু সমাধান। জাতির নিরাপদ ভবিষ্যতের কথা ভেবে শিশুদের প্রযুক্তি ব্যবহারের বিষয়ে এখনই যথাসম্ভব সতর্ক ও যত্নশীল হতে হবে। ইংরেজিতে একটি কথা আছে– There is no tomorrow for a child. ■

করোনাকালে প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়নে নেপ কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ

মোঃ শাহ আলম (অতিরিক্ত সচিব)
মহাপরিচালক, নেপ

একবিংশ শতাব্দীর বৈশ্বিক উন্নয়নের অব্যাহত ধারাকে থমকে দেয় কোভিড-১৯, যার প্রভাবে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে শিক্ষা-কার্যক্রম। প্রায় সবদেশেই কোভিড-১৯ বিস্তার প্রশমনে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে সাময়িকভাবে মুখোমুখি শিখন-শেখানো কার্যক্রম বন্ধ ঘোষণা করে। বিদ্যালয়গুলো বন্ধ থাকার ফলে শিক্ষার্থীদের শিখন-ঘাটতি বেড়েছে, অনেক শিক্ষার্থী ঝরে পড়েছে এবং সর্বোপরি শিক্ষার্থীদের মনো-সামাজিক অবস্থায় নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে। কোভিড-১৯ বিশ্বব্যাপী শিক্ষাব্যবস্থায় অনাকাঙ্ক্ষিত সংকট সৃষ্টি করেছে, যা সকল দেশের জন্য নির্দিষ্ট সময়ে এসডিজি'র লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ তৈরি করেছে।

কোভিড-১৯ সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশ সরকার ১৮ মার্চ ২০২০ হতে সকল ধরনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মুখোমুখি শিখন-কার্যক্রম সাময়িকভাবে বন্ধ করে দেয়। সরকারি আদেশে বলা হয়, স্বাস্থ্যবিধি পালন করে শিক্ষার্থীরা বাড়িতে অবস্থান করবে এবং বিকল্প পন্থায় শিখন-কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে। অনুরূপভাবে দেশের ৬৭টি প্রাইমারি টিচার্স ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (পিটিআই) ও তৎসংলগ্ন পরীক্ষণ বিদ্যালয়সমূহের মুখোমুখি শিখন-শেখানো কার্যক্রমও বন্ধ করে দেওয়া হয়।

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ) কোভিড-১৯ মহামারিকালে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাথে এসডিজির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে নিবিড়ভাবে কাজ করছে। নেপ মূলত দেশের ৬৭টি পিটিআইয়ের মাধ্যমে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্য শিক্ষক-শিক্ষা কার্যক্রম যেমন- ডিপ্লোমা-ইন প্রাইমারি এডুকেশন (ডিপিএড) ও সার্টিফিকেট-ইন এডুকেশন (সি-ইন-এড) আয়োজন করে। কারোনাকালে এই শিক্ষক-শিক্ষা কার্যক্রম সচল রাখার নিমিত্তে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ) প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম হাতে নেয়, যা এখনও চালু আছে। তাছাড়া প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য করোনাকালীন বিকল্প শিখন-শেখানো কার্যক্রম চালু রাখার নিমিত্তে 'ঘরে বসে শিখি' নামে টেলিভিশন ও রেডিও প্রোগ্রাম, ওয়ার্কশিট প্রণয়ন এবং অনলাইন পাঠদান কার্যক্রমে কারিগরি সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। করোনাকালে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের শিখন-শেখানো কার্যক্রম অব্যাহত রাখার জন্য নেপ কর্তৃক গৃহীত বা সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপসমূহ হলো-

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য রিমেডিয়াল পাঠপরিকল্পনা প্রণয়ন

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শ্রেণি-কার্যক্রম সারাদেশে এক ও অভিন্ন পদ্ধতিতে পরিচালনার বিষয় বিবেচনায় রেখে করোনার সময়ে ২০২০ সালে পাঁচ ধাপে ভিন্ন ভিন্ন ৫টি সংশোধিত বার্ষিক পাঠপরিকল্পনা (রিমেডিয়াল প্ল্যানসহ) তৈরি করা হয়। বিষয়-বিশেষজ্ঞ ও শ্রেণিশিক্ষকদের মতামতের ভিত্তিতে নেপ এই পাঠপরিকল্পনা প্রণয়ন করে, যা পরে এনসিটিবি কর্তৃক ভেলিডেট করা হয়। কিন্তু বিদ্যালয় না খোলার কারণে এগুলোর কোনোটিরই বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য ওয়ার্কশিট প্রণয়ন

লকডাউন দীর্ঘায়িত হওয়ায় প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের নির্দেশনায় ২০২১ সালের মে মাস হতে প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের পড়ালেখায় ব্যস্ত রাখতে ও ঝরে পড়া রোধে নেপ 'অন্তবর্তীকালীন পাঠপরিকল্পনা' প্রণয়ন কার্যক্রম শুরু করে। এই পরিকল্পনায় প্রত্যেকটি বিষয়ে শিক্ষার্থীদের অধিকাংশ শিখনফল অর্জনের বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে প্রথমে দুই সপ্তাহ, পরে ছয় সপ্তাহের জন্য (মোট ৮ সপ্তাহ) কর্মপরিকল্পনাসহ ওয়ার্কশিট ও এক্টিভিটি শিট (পরীক্ষামূলক বাড়ির কাজ) প্রণয়ন করে নেপ, যা প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মাধ্যমে সারাদেশে মাঠপর্যায়ে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। এই ওয়ার্কশিটভিত্তিক পাঠচর্চা শিক্ষার্থীদের করোনাকালীন শিখন-ঘাটতি পূরণে এবং শিখন-কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট রাখতে অধিকতর কার্যকর উদ্যোগ বলে সর্বমহলে প্রশংসিত হয়েছে।

ডিপিএড প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য অফলাইন ম্যাটেরিয়ালস ডেভেলপ

করোনাকালে পিটিআইসমূহের মুখোমুখি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বন্ধ থাকার ফলে ২০২০-২০২১ শিক্ষাবর্ষের প্রায় ২০০০০ ডিপিএড প্রশিক্ষণার্থীর শিখন ব্যাহত

হয়। মহামারিতে পিটিআই প্রশিক্ষণার্থীদের শিখন-কার্যক্রম অব্যাহত রাখার জন্য ২৩ এপ্রিল ২০২০ হতে রিমোর্ট লার্নিং ম্যাটেরিয়ালস ডেভেলপমেন্ট কার্যক্রম শুরু হয়। নেপ-এর বিষয়-বিশেষজ্ঞ ও পিটিআইয়ের দক্ষ ইনস্ট্রাক্টর এবং a2i-এর সহায়তায় ৬টি বিষয়ের প্রায় ২০০ ধরনের কন্টেন্ট ডেভেলপ করা হয়, যেগুলো প্রধানত- ভিডিও ক্লিপস, অডিও ক্লিপস, পিপিটি, পিডিএফ এবং ওয়ার্ড কপি। এই কন্টেন্টসমূহ নেপ ওয়েবসাইট ও নেপ ইউটিউব চ্যানেলে আপলোড করা হয়, যাতে পিটিআই প্রশিক্ষণার্থীরা সহজে তাদের সুবিধামতো ব্যবহার করতে পারেন।

রিমোট লার্নিং কার্যক্রম পরিচালনার নিমিত্তে প্রশিক্ষণের আয়োজন

করোনা মহামারির পূর্বে অনলাইন ম্যাটেরিয়ালস ডেভেলপমেন্ট ও অনলাইন শিখন কার্যক্রম পরিচালনায় নেপ ও পিটিআইয়ের কোনো অভিজ্ঞতা ছিল না। নেপ এসময় নিজস্ব উদ্যোগে অনুষদ সদস্য ও পিটিআই ইনস্ট্রাক্টরগণের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য রিমোট লার্নিং কার্যক্রম বিষয়ক প্রশিক্ষণের আয়োজন করে; এমন কিছু প্রশিক্ষণে কারিগরি সহায়তা প্রদান করে UNICEF। করোনাকালে ৩৮০জন কর্মকর্তাকে অনলাইনে বিভিন্ন বিষয়ে পেশাগত দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এই প্রশিক্ষণের ফলে পিটিআইসমূহে কার্যকরভাবে অনলাইনভিত্তিক ডিপিএড কোর্সের কার্যক্রম চলমান রাখা সম্ভব হয়।

ডিপিএড কোর্স ও পরীক্ষণ বিদ্যালয়ে অনলাইন ক্লাস পরিচালনা

করোনার সময়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে নেপ-এর ডিপিএড বোর্ড পিটিআইগুলোকে ২৩ এপ্রিল ২০২০ অনলাইনে ডিপিএড কার্যক্রম পরিচালনার নির্দেশনা প্রদান করে। বাংলাদেশের শিক্ষাক্ষেত্রে বিস্তৃত পরিসরে ও দীর্ঘমেয়াদে অনলাইন কোর্স পরিচালনার প্রথম দৃষ্টান্ত স্থাপন করে নেপ। প্রায় ২০০০০ শিক্ষার্থীকে এই অনলাইন ডিপিএড কার্যক্রমের আওতায় আনা হয়। নেপ কর্তৃক প্রণীত অনলাইন রুটিন অনুসারে পিটিআই ইনস্ট্রাক্টরগণ গুগলমিট প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে অনলাইন ক্লাস পরিচালনা করেন। মোবাইল ডিভাইস, ইলেকট্রিসিটি ও ইন্টারনেট নেটওয়ার্ক বিষয়ক সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও প্রায় ৯০% ডিপিএড প্রশিক্ষণার্থীর অনলাইন ক্লাসে উপস্থিতি নিশ্চিত করা সম্ভব হয়। প্রযুক্তি-নির্ভর অভূতপূর্ব এই প্রয়াস বিভিন্ন মহলে প্রশংসিত হয়।

এরই ধারবাহিকতায় পিটিআই-সংলগ্ন পরীক্ষণ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের শিখন-শেখানো কার্যক্রম অনলাইনে পরিচালনার জন্য নেপ কর্তৃক নির্দেশনা প্রদান করা হয়। ০১ সেপ্টেম্বর ২০২০ হতে পরীক্ষণ বিদ্যালয়ে ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের অনলাইনভিত্তিক (গুগলমিট প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে) শিখন-কার্যক্রম চালু করা হয়; এটিও প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে প্রথম উদ্যোগ।

অনলাইন ডিপিএড কার্যক্রম মনিটরিং

পিটিআইসমূহ এপ্রিল ২০২০ হতে ডিপিএড অনলাইন কার্যক্রম শুরু করে, যা সফলভাবে পরিচালনার জন্য নেপ-এর পক্ষ থেকে মনিটরিংয়ের উদ্যোগ নেওয়া হয়। নেপ-এর ৩২জন অনুষদ সদস্য ৬৭টি পিটিআইয়ের অনলাইন ক্লাস মনিটর করেন, যার মূল উদ্দেশ্য ছিল পিটিআই ইনস্ট্রাক্টরগণকে পেডাগজিক্যাল সাপোর্ট প্রদান ও প্রশিক্ষণার্থীদের অনলাইন ক্লাসে নিয়মিত অংশগ্রহণের জন্য উদ্বুদ্ধ করা।

ডিপিএড চূড়ান্ত লিখিত পরীক্ষা গ্রহণ

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমির একাডেমিক তত্ত্বাবধানে পিটিআইসমূহে চলমান ডিপ্লোমা-ইন-প্রাইমারি এডুকেশন (ডিপিএড) কার্যক্রম চলমান রয়েছে। প্রতি শিক্ষাবর্ষের শেষে শিক্ষার্থীদের চূড়ান্ত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হয় এবং এই ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে শিক্ষার্থীদের সনদ প্রদান করা হয়। করোনাকালে ডিপিএড শিক্ষার্থীদের এই চূড়ান্ত লিখিত মূল্যায়ন স্বাস্থ্যবিধি পালনপূর্বক পিটিআইসমূহে মুখোমুখি আয়োজন করা হয়। জানুয়ারি ২০১৯–জুন ২০২০ শিক্ষাবর্ষে ১৪৭৩১ প্রশিক্ষণার্থী চূড়ান্ত লিখিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে এবং ১৪৪৯৯ প্রশিক্ষণার্থী উত্তীর্ণ হয়; পাশের হার ছিল ৯৮.৪২%। পরবর্তী জানুয়ারি ২০২০–জুন ২০২১ শিক্ষাবর্ষে ১৯৫২৩ প্রশিক্ষণার্থী চূড়ান্ত লিখিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে এবং ১৯১০০ প্রশিক্ষণার্থী উত্তীর্ণ হয়; পাশের হার ছিল ৯৭.৮৩%। চূড়ান্ত পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের পর উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের যথাসময়ে সনদ প্রদান করা হয়।

অনলাইনে ডিপিএড চূড়ান্ত মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ

করোনা বিধিনিষেধ থাকার কারণে নেপ কর্তৃপক্ষ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে ডিপিএড পরীক্ষার্থীদের চূড়ান্ত মৌখিক পরীক্ষা অনলাইনে গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়। ফলে ২০১৯-২০২০ শিক্ষাবর্ষের ১৪৭৩১জন প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষক মৌখিক পরীক্ষায় ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে অংশগ্রহণ করে; যা বাংলাদেশে শিক্ষাক্ষেত্রের ইতিহাসে একটি মাইলফলক, এর আগে কোনো প্রতিষ্ঠান এত বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থীর ভাইভা অনলাইনে একযোগে গ্রহণ করেনি।

ডিপিএড পরীক্ষার ফলাফল ডিজিটাল মাধ্যমে প্রকাশ

৪ অক্টোবর ২০২০ তারিখে ২০১৯-২০২০ শিক্ষাবর্ষের ১৪৭৩১জন ডিপিএড শিক্ষার্থীর চূড়ান্ত ফলাফল অনলাইনে প্রকাশ করা হয়। শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত মোবাইল নম্বরে কোনো ধরনের রেজিস্ট্রেশন বা চার্জ ব্যতীত এসএমএস'র মাধ্যমে এই ফলাফল প্রেরিত হয়। একে দেশে প্রথমবারের মতো প্রাক-রেজিস্ট্রেশন ব্যতীত মোবাইল এসএমএস'র মাধ্যমে অনলাইনে ফলাফল প্রকাশের দৃষ্টান্ত বলে বিবেচনা করা হয়। এই কার্যক্রম পরবর্তী সকল শিক্ষাবর্ষের জন্যই অব্যাহত রয়েছে।

পিটিআই রি-ওপেনিং গাইডলাইনস প্রণয়ন

করোনা-পরবর্তী সময়ে প্রশিক্ষণার্থীদের স্বাস্থ্যঝুঁকির বিষয়টি প্রাধান্য দিয়ে পিটিআই কার্যক্রম পরিচালনার জন্য নেপ একটি রি-ওপেনিং গাইডলাইন প্রণয়ন করে। এই গাইডলাইনে অবকাঠামো, স্বাস্থ্যবিধি ও পাঠদান-কার্যক্রম বিষয়ক নির্দেশনা দেওয়া হয়। তাছাড়া পিটিআইসমূহ পুনরায় চালু করার পূর্বে করণীয় কী, পিটিআই কার্যক্রম চলমান অবস্থায় কোন বিষয়গুলো মেনে চলতে হবে এবং ইমার্জেন্সি বিষয়কে মাথায় রেখে দীর্ঘমেয়াদে কী পরিকল্পনা নিতে হবে- তা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করে রি-ওপেনিং গাইডলাইনে নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

করোনাকালীন গবেষণা কার্যক্রম

করোনা মহামারিকালে প্রাথমিক শিক্ষা নিয়ে সরকারের গৃহীত নানা পদক্ষেপের অন্যতম হলো সংসদ বাংলাদেশ টেলিভিশন ও বাংলাদেশ বেতারের মাধ্যমে প্রচারিত 'ঘরে বসে শিখি' প্রোগ্রাম। এই প্রোগ্রামকে আরও যুগোপযোগী করা এবং সেসবের সফলতা নিশ্চিতকরণে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনায় নেপ চারটি গবেষণা পরিচালনা করে। এগুলো হলো− (1) Efficacy of Audio Contents of 'GHORE BOSE SHIKHI' Radio Programme A Review, (2) Students' Learning Progress During Covid-19: A Study on 'Ghore Boshe Shikhi' (3) Exploring the User Experience of 'Ghore Boshe Shikhi' Radio Programme, (4) Effectiveness of 'Ghore Boshe Shikhi' Television Programme During Covid-19: Policy, Process and Practice.

এই গবেষণাগুলোতে প্রাপ্ত ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে 'ঘরে বসে শিখি' প্রোগ্রামের কার্যকারিতা বাড়াতে সুনির্দিষ্ট সুপারিশ প্রদান করা হয়। প্রাপ্ত সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর চলমান 'ঘরে বসে শিখি' রেডিও এবং টেলিভিশন প্রোগ্রামকে আরও ফলপ্রসূ করতে পারবে। জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ) কর্তৃক পরিচালিত এই গবেষণাগুলো বাংলাদেশের ই-লার্নিং তথা রেডিও-টেলিভিশনভিত্তিক দূরশিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

সরকার ঘোষিত প্রযুক্তি-নির্ভর ডিজিটাল বাংলাদেশের সুবিধা ব্যবহার করে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা ও সহযোগিতায় জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি ব্লেন্ডেড পদ্ধতির যে শিখন-শেখানো কার্যক্রম গ্রহণ করে তা একদিকে যেমন করোনাকালে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের শিখন-ঘাটতি নিরসনে কার্যকর ভূমিকা রেখেছে, তেমনি ভবিষ্যতে শিক্ষায় প্রযুক্তির ব্যবহারের এক নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করেছে। নেপ সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার অভিযাত্রায় সহযোগী হতে পেরে গর্বিত। ■

এসডিজি-৪ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর "আউট-অব-স্কুল চিলড্রেন" কর্মসূচি

বর্তমান শিক্ষা-বান্ধব সরকার জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) পূরণে যে কর্মসূচি গ্রহণ করেছে, তা বাস্তবায়নে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা থেকে ঝরে পড়া ও বিদ্যালয় বহির্ভূত শিক্ষার্থীদের উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রদান ও শিক্ষার মূলস্রোতে পুনর্বাসন, বয়স্ক ও নিরক্ষর জনগোষ্ঠীকে অক্ষরজ্ঞান দান ও জীবিকায়ন দক্ষতা অর্জনে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা ও জীবনব্যাপী শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করার মাধ্যমে এসডিজি-৪ লক্ষ্যমাত্রা পূরণে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে।

মুজিববর্ষকে সামনে রেখে নানামুখী তৎপরতা সত্ত্বেও শতভাগ সাক্ষরতা অর্জনে সরকারের লক্ষ্য পূরণ সম্ভব হয়নি। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর হতে ২০২০ সালে প্রকাশিত Annual Primary School Census (APSC) হতে দেখা যায়, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী ভর্তি হার প্রায় শতভাগ (৯৭.৩৭%) হলেও প্রায় ৮২.৮০% শিক্ষার্থী প্রাথমিক শিক্ষাচক্র সমাপন করতে সক্ষম হয়। অর্থাৎ প্রায় ১৭.২০% শিক্ষার্থী ৫ম শ্রেণি সমাপনের পূর্বেই হারিয়ে যায়। এ বিবেচনায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কখনও ভর্তি হয়নি এবং প্রাথমিক শিক্ষাচক্র সমাপন করার পূর্বেই যেসকল শিশু ঝরে পড়েছে তাদের জন্য শিক্ষার দ্বিতীয় সুযোগ (Second Chance Education) সৃষ্টি করার প্রয়াসে পিইডিপি-৪-এর আওতায় 'আউট-অব-স্কুল চিলড্রেন' কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

আউট-অব-স্কুল চিলড্রেন কার্যক্রমের আওতায় বাংলাদেশের ৬৪ জেলার ৩৪৫টি উপজেলা, ১২টি সিটি কর্পোরেশন ও ৩টি পৌরসভায় মোট ১০ লক্ষ ৮-১৪ বছর বয়সী বিদ্যালয়-বহির্ভূত শিশুকে উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা আইন অনুযায়ী উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর মাধমে আউট-অব-স্কুল চিলড্রেন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এ কার্যক্রমের আওতায় উপজেলা পর্যায়ে ২৬,৪৮২টি, শহরাঞ্চলে ৩,৪৪০টি মোট ২৯,৯২২টি শিখনকেন্দ্র স্থাপনের কাজ চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। এ কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে বিদ্যালয়-বহির্ভূত শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা সমাপন ও শিক্ষাব্যবস্থার মূলধারায় ফিরে যাওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হবে। প্রকল্প দলিলের নির্দেশনা মোতাবেক পিইডিপি-৩-এর অধীনে গত ১ সেপ্টেম্বর ২০১৮ হতে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো কর্তৃক ৬ (ছয়) জেলায় (ঢাকা, চট্টগ্রাম, কিশোরগঞ্জ, গাইবান্ধা, সিলেট, সুনামগঞ্জ) চারটি ভিন্ন ভিন্ন মডালিটিতে (১. কোহর্ট, ২. শিখন, ৩. মাল্টিগ্রেড, ৪. এবিএএল) ১ (এক) লক্ষ বিদ্যালয়-বহির্ভূত শিশুর জন্য (পিইডিপি-৩-এর আওতায় ভর্তিকৃত) আউট-অব-স্কুল চিলড্রেন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় গত ১ অক্টোবর ২০১৯ হতে ১ (এক) লক্ষ বিদ্যালয়-বহির্ভূত শিশুর জন্য চলমান কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে চারটি বাস্তবায়ন সহায়ক সংস্থা (ISA)– ব্র্যাক (BRAC), আরডিআরএস বাংলাদেশ (RDRS), Friend In Village Development Bangladesh (FIVDB) এবং জাগরণী চক্র ফাউন্ডেশন (JCF)-কে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। ২০১৯ সালে এ কর্মসূচি হতে ২৩৩ জন শিক্ষার্থী প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে, তন্মধ্যে ২১৯জন (৯৪%) শিক্ষার্থী উত্তীর্ণ হয়েছে এবং ১১,২৭৯জন (১১%) শিক্ষার্থীকে প্রাথমিক শিক্ষার মূলধারায় সম্পৃক্ত করা হয়েছে। ২০২০ সালে ১২৪৪জন শিক্ষার্থী ৫ম শ্রেণি উত্তীর্ণ হয়েছে এবং ২০,৫০০জন শিক্ষার্থীকে প্রাথমিক শিক্ষার মূলধারায় সম্পৃক্ত করা হয়েছে। উল্লেখ্য, কোভিড-১৯ অতিমারির কারণে ২০২০ সালে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়নি।

করোনা ভাইরাস (COVID-19) পরিস্থিতিতে সরকারি সিদ্ধান্ত মোতাবেক শিখনকেন্দ্রসমূহে ছুটি চলাকালে শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ার ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য গত এপ্রিল ২০২০ হতে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের উদ্যোগে 'সংসদ বাংলাদেশ টেলিভিশন', ইউটিউব এবং রেডিওতে প্রচারিত প্রাথমিক শিক্ষার বিষয়ভিত্তিক পাঠদান কর্মসূচি 'ঘরে বসে শিখি' অনুষ্ঠানের সাথে ৬টি জেলায় চলমান "আউট-অব-স্কুল চিলড্রেন" কার্যক্রমের আওতাধীন শিক্ষার্থীদেরকে সম্পৃক্ত করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানের সাপ্তাহিক ক্লাস রুটিন ৬টি জেলার সংশ্লিষ্ট বাস্তবায়নকারী সংস্থাসমূহের বরাবর প্রেরণ করা হয়। শিক্ষার্থীদেরকে উদ্বুদ্ধ ও ফলোআপকরণের লক্ষ্যে শিখনকেন্দ্রের সংশ্লিষ্ট শিক্ষকগণও নিয়মিত ক্লাস অনুসরণ করেন। এছাড়াও, 'ঘরে বসে শিখি' অনুষ্ঠান অনুসরণে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণের বিষয়টি নিয়মিত মনিটরিং করা হয়। উল্লেখ্য, কোভিড-১৯ অতিমারিকালীন শিখনকেন্দ্রসমূহে ছুটির সময়ে "আউট-অব-স্কুল চিলড্রেন" কার্যক্রমের আওতাধীন শতকরা প্রায় ৫৪ ভাগ শিক্ষার্থী 'ঘরে বসে শিখি' অনুষ্ঠান অনুসরণ করেছে।

অবশিষ্ট ৯ লক্ষ শিশুর জন্য শিক্ষাকার্যক্রম শুরুর লক্ষ্যে প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। এ কর্মসূচি সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো কর্তৃক স্পেশালাইজড এজেন্সি (SA) হিসেবে শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা

বিশ্ববিদ্যালয়কে নিযুক্ত করা হয়েছে। বাস্তবায়ন সহায়ক সংস্থা হিসেবে নির্বাচিত মোট ৫৩টি বেসরকারি সংস্থার সাথে সেপ্টেম্বর ২০২০ মাসে চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ৫২টি জেলায় ১১টি সিটি কর্পোরেশন, ৩টি পৌরসভা ও ২৯০টি উপজেলাতে আউট-অব-স্কুল চিলড্রেন কার্যক্রমবিষয়ক ওরিয়েন্টেশন কর্মশালা আয়োজন করা হয়েছে। মাঠপর্যায়ে বিদ্যালয়-বহির্ভূত শিশু জরিপ কার্যক্রম সমাপ্ত হয়েছে। জরিপের মাধ্যমে ৯ লক্ষ ৩১ হাজার ৭ শত ৫৩ জন শিশুকে চিহ্নিত করা হয় এবং জরিপে প্রাপ্ত তথ্যাদি অনলাইন ডাটা এন্ট্রির মাধ্যমে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর সার্ভারে ডাটাবেইজের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়েছে। বর্তমানে জরিপকৃত শিশুদের তালিকাটি প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর (ডিপিই) কর্তৃক যাচাই-বাছাইয়ের কাজ চলমান রয়েছে। প্রতিটি জেলায় শিখনকেন্দ্র স্থাপনবিষয়ক প্রস্তুতিমূলক কাজ যেমন, শিক্ষক ও সুপারভাইজার নির্বাচন, কেন্দ্র ঘর নির্বাচন, সিএমসি গঠন ইত্যাদি চলমান রয়েছে। নভেম্বর ২০২১ হতে শিখনকেন্দ্র চালু করার বিষয়ে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়।

এ কার্যক্রমের আওতায় যেসব শিশু ভর্তি হবে, তাদের বয়স এবং বিদ্যালয়ে যাওয়ার সময় বিবেচনা করে একটি নমনীয় শিখনপ্রক্রিয়া অনুসরণ করে অপেক্ষাকৃত কম সময়ে প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন করা হবে। শিখন কেন্দ্রসমূহে ভর্তিকৃত শিশুরা পাঁচ বছরের প্রাথমিক শিক্ষাচক্র ৪২ মাসে (অর্থাৎ ৩ বছর ৬ মাসে) সম্পন্ন করবে। এক্ষেত্রে শিশুরা প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় শ্রেণি প্রতিটি ৬ মাস করে মোট ১৮ মাসে সম্পন্ন করবে। এরই ধারাবহিকতায় চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণি ১ বছর করে মোট ২ বছরে সম্পন্ন করবে। এলক্ষ্যে জাতীয় পাঠ্যক্রম অনুসরণে একটি এক্সিলারেটেড লার্নিং মডেল প্রণয়ন করা হয়েছে। এই এক্সিলারেটেড লার্নিং মডেলে প্রাথমিক শিক্ষার ২৯টি প্রান্তিক যোগ্যতার সবগুলোকেই বিবেচনা করা হয়েছে। ৪২ মাসের শেষে শিশুরা প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে সমযোগ্যতা অর্জন করবে। শিখনকেন্দ্রসমূহে এনসিটিবি প্রণীত শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক অনুসরণ করা হবে। একজন শিক্ষক কর্তৃক সপ্তাহে ৫ দিন ২০-৩০ জন শিক্ষার্থী নিয়ে সুবিধামতো সময়ে সকালে বা বিকেলে তিন ঘন্টা করে শিখনকেন্দ্রের কার্যক্রম পরিচালনার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। গ্রামাঞ্চলে শিখনকেন্দ্রসমূহ একক শিফটে এবং শহরাঞ্চলে দুই শিফটে পরিচালনা করা হবে।

আউট-অব-স্কুল চিলড্রেন কর্মসূচি বাস্তবায়িত হলে শিক্ষার সুযোগ বঞ্চিত বিদ্যালয়বহির্ভূত ও ঝরেপড়া শিশুদের শিক্ষার বিকল্প সুযোগ সৃষ্টি হবে। এর ফলে এই বিশাল জনগোষ্ঠী ভবিষ্যতে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ গ্রহণের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানের যোগ্যতা অর্জন করবে এবং দক্ষ মানবসম্পদে পরিণত হবে, যা সরকারের অন্যান্য অর্জনের পাশাপাশি এসডিজি-৪-এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ভূমিকা রাখবে। ■

মুজিববর্ষে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ইউনিটের কার্যক্রম

সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে ঘরে ঘরে শিক্ষার আলো পৌঁছে দেয়ার জন্য স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে ১৯৭৩ সালে প্রাথমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করেন। সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখে আইনগত বাধ্যবাধকতা অপরিহার্য হওয়ায় জাতীয় সংসদ কর্তৃক 'প্রাথমিক শিক্ষা (বাধ্যতামূলককরণ) আইন ১৯৯০' পাস করা হয়। এ আইনের যথাযথ বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হয় 'বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ইউনিট'। এ ইউনিটটি বর্তমানে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন একটি দপ্তর হিসেবে কাজ করছে। প্রাথমিক শিক্ষা উপযোগী সকল শিশুর বিদ্যালয়ে ভর্তি নিশ্চিতকরণসহ মানসম্মত শিক্ষা বাস্তবায়ন করা এ ইউনিটের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য।
মুজিববর্ষে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত কর্মসূচি ও লক্ষ্যমাত্রাসমূহ বাস্তবায়নে পরিবীক্ষণ ইউনিট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। মুজিববর্ষে এ ইউনিট যেসব কর্মসূচি গ্রহণ করে এখানে তার একটি খণ্ডচিত্র উপস্থাপন করা হলো।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমের আওতায় মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণের বিষয়টি ইউনিটের কর্মকর্তাগণ কর্তৃক মনিটর করে ফিডব্যাক প্রদান করা হয়। বিদ্যালয় পরিদর্শনকালে ক্যাচমেন্ট এলাকায় জরিপকৃত সকল শিশুকে বিদ্যালয়ে ভর্তির আওতায় আনার বিষয়টি মনিটর করা হচ্ছে। এছাড়া শিক্ষার্থীদের শিখন অগ্রগতি পর্যালোচনা, বিদ্যালয়ের চলমান উন্নয়নমূলক কার্যক্রম তদারকিসহ SLIP-এর আওতায় গৃহীত কর্মসূচি বাস্তবায়ন মনিটর করা হচ্ছে। এছাড়াও কোভিড-১৯ মহামারিকালে শিক্ষার্থীদের শিখন-ঘাটতি চিহ্নিতকরণ ও নিরাময়যোগ্য পাঠপরিকল্পনা (Accelerated Remedial Learning Plan), ২০২১ অনুসারে বিদ্যালয়ের পাঠদান কার্যক্রম পরিচালিত হওয়ার বিষয়টি ইউনিটের কর্মকর্তাগণ কর্তৃক সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়।

বর্ণাঢ্য ও যথাযোগ্য মর্যাদায় মুজিববর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ইউনিট কর্তৃক গত ০৭ মার্চ ২০২১ তারিখে ধানমণ্ডি ৩২-এ স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। মহাপরিচালক মহোদয়ের নেতৃত্বে ইউনিটের সকল স্তরের কর্মকর্তা উক্ত কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন।

মুজিববর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী বর্ণাঢ্য ও যথাযোগ্য মর্যাদায় উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ইউনিটের উদ্যোগে গত ০৮ মার্চ ২০২১ তারিখে 'বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ : রাজনৈতিক মহাকাব্য' বিষয়ক সেমিনার ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ইউনিটের মহাপরিচালক জনাব মোঃ শহীদুল হক ভূঁঞা, এন.ডি.সি (অতিরিক্ত সচিব)-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সেমিনার ও আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (বিদ্যালয়) জনাব রতন চন্দ্র পণ্ডিত উপস্থিত ছিলেন। ইউনিটের সকল স্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ সেমিনার ও আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ করেন।

মুজিববর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে গত ০৮ মার্চ ২০২১ তারিখে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ইউনিটের সম্মেলন কক্ষে বঙ্গবন্ধু কর্নার স্থাপন করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধু কর্নারে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রাজবন্দী হিসাবে কারাগারে থাকার সময় তাঁর রচিত তিনটি গ্রন্থ, যথা: *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, *কারাগারের রোজনামচা*, *আমার দেখা নয়া চীন*সহ বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্মের ওপর রচিত বিভিন্ন গ্রন্থ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা হয়েছে।■

প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়নের নিমিত্তে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শন ও অংশীজনের সাথে মতবিনিময়

করোনা মহামারির কারণে প্রায় ৬৫ সপ্তাহ বন্ধ থাকার পর গত ১২ সেপ্টেম্বর ২০২১ হতে বিদ্যালয়ের মুখোমুখি প্রাথমিক শ্রেণিকার্যক্রম শুরু হয়েছে। আশঙ্কা করা হচ্ছে, এই মহামারির সময়ে শিক্ষার্থীদের শিখন-ঘাটতি হয়েছে, অনেকেই মানসিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং শিক্ষার্থীরা ঝরে পড়েছে। করোনাকালীন শিক্ষার্থীদের শিখনে সহায়তার জন্য সরকার 'ঘরে বসে শিখি' টিভি ও রেডিও শিখনকার্যক্রম, গুগলমিটে পাঠদান কার্যক্রম ও মাঠপর্যায়ে ওয়ার্কশিট বিতরণ কার্যক্রম চালু করে। বিদ্যালয়ে পুনরায় শ্রেণিকার্যক্রম শুরু ও শিক্ষার্থীদের শিখন-ঘাটতি বিবেচনায় নেপ ও এনসিটিবি Accelerated Remedial Learning Plan (ARLP) প্রণয়ন করে, এবং সে অনুযায়ী বিদ্যালয়ের শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনার জন্য মাঠপর্যায়ে নির্দেশনা দেওয়া হয়।

বিদ্যালয়ের মুখোমুখি শিখনকার্যক্রম পুনরায় চালু হওয়ার পর, শিক্ষার্থীদের শিখনের বর্তমান অবস্থা জানার জন্য প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয় ২০২১ সালের অক্টোবর-নভেম্বর দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে বিদ্যালয়ে শিখন-শেখানো কার্যক্রম পর্যবেক্ষণের পাশাপাশি তিনি বিদ্যালয়ের অবকাঠামো, শিক্ষার পরিবেশ এবং প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়ন বিষয়ে অংশীজনের সাথে মতবিনিময় করেন। পরিদর্শনকালে প্রাপ্ত বিভিন্ন বিষয় ও সুপারিশসমূহ নিম্নে তুলে ধরা হলো–

শিখন-শেখানো কার্যক্রম

পরির্দনকালে বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের শহর ও গ্রামের স্কুলসমূহের শিখন-শেখানো কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায় যে, শহরের শিক্ষার্থীদের অধিকাংশই গুগলমিট ও ওয়ার্কশিট কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত হতে পেরেছে, অন্যদিকে গ্রামের বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা শুধুমাত্র ওয়ার্কশিট কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত হতে পেরেছে। শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের মৌখিক প্রশ্ন ও বোর্ডে লিখতে দিয়ে দেখা যায় বেশির ভাগ শিক্ষার্থীর পারদর্শিতার মান সন্তোষজনক। কোভিডকালে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপের কারণে শিক্ষার্থীদের শিখন-ঘাটতি হতাশাব্যঞ্জক নয়, যা পরিদর্শনকালে প্রতীয়মান হয়েছে।

কোভিডের কারণে বিদ্যালয়গামী শিক্ষার্থীদের মনো-সামাজিক অবস্থা অনেকটাই ট্রমাটাইজড থাকতে পারে মর্মে ধারণা করা হয়েছিল; কিন্তু পরিদর্শনকালে ১ম থেকে ৫ম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের শ্রেণিকক্ষে শিখন-শেখানো কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করে এবং শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলে তাদের বেশির ভাগেরই মনো-সামাজিক অবস্থা সন্তোষ-জনক মনে হয়েছে। শ্রেণিকক্ষে তাদের বিভিন্ন শিখন-শেখানো কার্যক্রমে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ এবং নির্ভয়ে শিক্ষকগণকে বিষয়বস্তু-সংশ্লিষ্ট প্রশ্ন করতে দেখা গেছে।

পরিদর্শনকৃত বিদ্যালয়সমূহে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি ছিল প্রায় ৭৫%-৯০%। বিদ্যালয়ে মুখোমুখি শিখন-কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে পেরে শিক্ষার্থীদের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ততা পরিলক্ষিত হয়।

পরিদর্শনকালে বিদ্যালয়ের বেশির ভাগ শিক্ষার্থীকে স্কুলড্রেস পরিহিত পাওয়া যায় এবং স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণপূর্বক প্রত্যেক বেঞ্চে ১জন করে বসে শ্রেণিকক্ষে শিখন-শেখানো কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে দেখা যায়। বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষার্থীকে মাস্ক পরিহিত অবস্থায় পাওয়া যায়। পরিদর্শনকৃত বিদ্যালয়ের প্রতিটিতেই শ্রেণিশিক্ষককে সরবরাহকৃত ARLP অনুসরণে শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করতে দেখা যায়। এক্ষেত্রে শিক্ষকগণ ARLP-র ওপর ওরিয়েন্টেশন পেয়েছেন এবং কীভাবে তা বাস্তবায়ন করতে হবে সে সম্পর্কে অবহিত হয়েছেন বলে জানান। তবে পূর্ববর্তী শ্রেণির পাঠ বা পূর্বপাঠের সাথে যৌক্তিকভাবে সংযোগ স্থাপনে কিছু কিছু ক্ষেত্রে শিক্ষকগণের দুর্বলতা পরিলক্ষিত হয়। পরিদর্শনকালে শিক্ষকগণের ARLP বিষয়ক সীমাবদ্ধতা চিহ্নিত করে কীভাবে শ্রেণিকক্ষে কার্যকরভাবে ব্যবহার করতে হবে তা হাতে-কলমে দেখিয়ে দেওয়া হয়।

বিদ্যালয়ের পরিবেশ, অবকাঠামো ও নিমার্ণ কাজ

পরিদর্শনকালে প্রতিটি বিদ্যালয়ের পরিবেশ ছিল সন্তোষজনক। প্রত্যেক বিদ্যালয়ের ওয়াশ-ব্লক এবং স্যানিটেশন ব্যবস্থা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ছিল। অধিকাংশ বিদ্যালয়ের অবকাঠামো ও নিমার্ণ কাজে বিভিন্ন ধরনের ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়। কোনো কোনো বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষের স্বল্পতা নিরসনকল্পে ভার্টিক্যাল সম্প্রসারণের জন্য তাৎক্ষণিকভাবে সংশ্লিষ্ট নিমার্ণকারী কর্তৃপক্ষকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়। কোনো কোনো বিদ্যালয়ের সীমানাপ্রাচীর নির্মাণ, বিদ্যালয়ের জমির কাগজপত্র হালনাগাদ করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়। তাছাড়া নিরাপদ পানি সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য প্রতিদিনের চাহিদা অনুযায়ী সকালবেলা খাবারের পানি ওভারহেড ট্যাংকিতে মজুদ করা এবং দিনশেষে ট্যাংকির অব্যবহৃত পানি ফেলে দেওয়ার জন্য পরামর্শ প্রদান করা হয়।

বিভাগীয় উপপরিচালকের কার্যালয় পরিদর্শন করে কার্যালয়ের পরিবেশ সন্তোষজনক পাওয়া যায়। তবে দাপ্তরিক কাজে ব্যবহৃত ফাইলপত্র গুছিয়ে রাখার জন্য পরামর্শ প্রদান করা হয়। অন্যদিকে পরিদর্শিত বেশির ভাগ ডিপিইও অফিসের পরিবেশও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পাওয়া যায়। তবে ডিপিইও অফিসসংলগ্ন স্টোররুম (গোডাউন) অগোছালো পাওয়া যায়, যাতে পরিত্যক্ত মোটরসাইকেল, বিভিন্ন যন্ত্রাংশ, কাগজপত্র ইত্যাদি ছিল। অগোছালো অবস্থায় গোডাউনের পরিত্যক্ত সরঞ্জামাদি যথাযথ নিয়ম অনুসরণ করে নিলামের মাধ্যমে বিক্রি করে অনতিবিলম্বে গোডাউনকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়। উল্লেখ্য, ডিপিইও অফিস করিডোরে/গোডাউনে এনসিটিবি কর্তৃক প্রণীত প্রজেক্টভিত্তিক লার্নিংয়ের ওপর বিপুল পরিমাণ শিক্ষক-নির্দেশিকা পাওয়া যায়, যেগুলো ব্যবহারের সুস্পষ্ট নির্দেশনা দেওয়া হয়নি বলে জানা যায়।

পরিদর্শিত পিটিআইসমূহের অফিসকক্ষসহ একাডেমিক ভবন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পাওয়া যায়। তবে প্রায় প্রতিটি পিটিআইয়ে পর্যাপ্ত পরিমাণ অব্যবহৃত জায়গা আছে লক্ষ করা যায়। জায়গাগুলো কার্যকরভাবে ব্যবহারের জন্য মাস্টার প্ল্যানের আওতাভুক্ত করার জন্য পরামর্শ প্রদান করা হয়। তাছাড়া যেসব পিটিআইয়ের জায়গা বেদখল হয়ে গেছে, তাদের দখলকৃত জায়গা পুনরুদ্ধারের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে পিটিআই কর্তৃপক্ষকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

গুণগত জনবল

পরিদর্শিত বিদ্যালয়সমূহের বেশির ভাগ শিক্ষকের দীর্ঘমেয়াদি প্রশিক্ষণ সি-ইন-এড/ডিপিএড-এর পাশাপাশি বিভিন্ন স্বল্পমেয়াদি প্রশিক্ষণ রয়েছে। তাছাড়া বেশির ভাগ শিক্ষকের শিক্ষাগত যোগ্যতা স্নাতক বা স্নাতকোত্তর। অনেক শিক্ষককে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে দক্ষভাবে শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করতে দেখা গেছে।

উল্লেখ্য, সচিব মহোদয়ের প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শনের ভিত্তিতে মাঠপর্যায়ে বাস্তবায়নযোগ্য ২৭ দফা নির্দেশনা প্রদান করা হয়। মাঠপর্যায়ের সকল দপ্তর ও কর্মকর্তাকে উপরিউক্ত বিষয়গুলো ক্ষেত্রমতে ও বিধিমতে প্রতিপালন করার জন্য নির্দেশনা দেওয়া হয়, এগুলোর যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিত হলে আশা করা যায় মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন ত্বরান্বিত হবে।■

Students' Assessment Practices in Primary Education during the COVID-19

Mohammad Abu Bakar Siddik
Assistant Specialist, NAPE

Since the outbreak of the COVID-19 in 2020, the pandemic has disrupted the education system worldwide, and severely affected the most vulnerable and marginalised learners. More than 1.6 billion children could not attend in-person classroom activities for months (UNESCO, 2021), which has been considered a major disruption in education systems in a century. This worsened situation compelled the educational authorities to think about alternative ways in continuing education during the school closures. Most education providers transformed their education systems to online or blended learning or remote learning to address the learning crisis (Daniel, 2020). Despite having many challenges, remote learning or online teaching was the most viable solution during that time to minimize student's learning loss.

In Bangladesh, like other countries, in-person activities of schools and educational institutions have been temporarily suspended for around two years - since March, 2020 to control the spread of COVID-19. The immediate direct impact of the long-term school closure was the discontinuation from learning of around 36.8 million children (MoE, 2020). To engage the primary students through central distant learning mechanisms, the government has taken some quick initiatives, like- developing remote learning contents and rolling out lessons through four platforms: Electronic Media, Radio, Mobile and online (MoPME, 2020). The state-run 'Shangshad Bangladesh Television' has started broadcasting the primary textbook contents from April 7, 2020. Besides, radio-based "Ghore Bose Shikhi" programme, to reach more students who do not have television facilities, has started through 'Bangladesh Betar' since 12 August 2020.

The school teachers and field-level education officers made tremendous efforts to teach students through online using the Google Meet platform, and also distribute worksheets to them with the best care during this pandemic under the guidance of the Ministry of Primary and Mass Education. It is observed that the school teachers faced challenges, like– getting support in online teaching, internet coverage, grading and assessing students' learning progress. The aforesaid remote learning interventions were made during this pandemic to continue education, but there were no specific guidelines given by the authority to check the students' learning progress how the remote learning programmes support students. The students' assessment was a grey area during that time, which is a crucial issue for students, teachers and authorities to redesign the teaching-learning activities (Rahman and Siddik, 2022).

Assessment is a crucial factor in the learning process where students demonstrate their abilities and identify the areas for further progress (Amelung et al., 2011), as well as an important process of collecting and interpreting educational information from students by teachers to reward a grade (Brink & Lautenbach, 2011). The COVID-19 provided a catalyst to rethink assessment strategies in education. It suggests a need for a fresh look at flexible forms of assessment; covering terminal examinations, teacher assessment of learning and assessment in a remote learning. A central comprehensive planning is required to identify appropriate ways for assessments in remote learning, so that teachers can effectively track student learning progress, especially students who are behind the class level, provide remedial supports, and are aware of students' learning gaps. But, the Bangladeshi primary school teachers adopted different strategies and developed diversified assessment tools by themselves to evaluate the learning progress during the pandemic.

During the school closure, the primary students are supposed to attend the "Ghore Boshe Shikhi" educational programme while they are staying at home. The students of grades III to V are expected to do homework after participating the classes through a remote platform, particularly TV, and submitting it to their subject-teachers once schools reopen. Most of the students showed their completed homework to their respective teachers, and the teachers reviewed their homework and evaluated giving comments. The grading on the homework assignments have been considered as a part of students' formative assessment.

Moreover, considering the issue of inclusiveness- reaching all children, the teachers distributed printed worksheets to millions of students across the country. The worksheets were developed as for both

learning and assessment tools following the NCTB textbooks. In most cases, the class teachers distributed these worksheets during home-visit, and guardians also collected those from school in some cases. This worksheet distribution programme acted as a communication tool with the students during the pandemic. The teachers asked students to do the worksheet-related activities following the TV/Radio/Google Meet classes, and submitted those worksheets after every fortnight. The classroom teachers checked and graded those worksheets and gave oral feedback in-person or over the phone for further improvement. Another technique 'Using textbook as a worksheet" was used during that time, especially for the students of grades I to III as most of the activities were given as worksheet formatted in the textbooks. This technique did not consider earlier as a part of assessment tools in our country. The teachers asked students to work on the activities using pen/pencil given in the textbook, and submitted it to their respective subject teachers. The teachers evaluated those making written comments. This technique was cost-saving and created an opportunity to make students relate with the textbooks during the pandemic; it also helped the teachers support the early grade students in achieving their basic literacy and numeracy skills.

Furthermore, some teachers prepared questionnaires at the end of the academic cycle, and administered those questionnaires during home-visit. It is noted that this action was taken by local teachers in some areas, which was not encouraged by the authority later due to health safety issue. However, the teachers used that test data to promote the students to the next classes.

Again, some expert teachers were able to conduct e-assessment which means using the ICT to manage and record students' responses and provide feedback. This technique was used for grade IV to V students while they participated in Google Meet classes. The advanced teachers used online quizzes using different apps like- Google Forms, Kahoot at the end of the session to check student's learning. It was reported that some students even sent the answers to their teachers after the online sessions using Facebook Messenger or WhatsApp. The teachers used these students' evaluation data as part of the formative assessment.

Different types of mechanisms and assessment tools were administered across the country during the pandemic as a part of formative assessment which required a standard guideline to maintain uniformity across the country. Most of the teachers shared that they faced problems in evaluating worksheets, homework and other assignments as there was no assessment rubric that they would follow. Activity-wise assessment rubrics focusing leaning competencies and a generic grading template need to be developed to remove biases and maintain the validity and reliability of the assessment process.

The assessment plans constantly changed during the pandemic as the teachers made efforts continuously aligned with the curriculum objectives. This challenging period created the opportunity for classroom teachers to apply different assessment tools countrywide as a part of formative assessment, which was also a new experience for some teachers and students. On the other hand, it was impossible to change mindsets about formative assessment quickly as teachers and students have encountered mainly written examinations as an indicator of academic achievements. However, this pandemic opened a new window for us to rethink alternative ways of student assessment; and it is believed that these experiences will support the teachers and concerned educational authorities to implement the new primary curriculum where the formative assessment was emphasized mostly.

References

1. Brink, R. and Lautenbach, G. (2011), "Electronic assessment in higher education", Educational Studies. Vol. 37 No. 5, pp. 503-512.
2. Daniel, J. (2020). Education and the COVID-19 pandemic. Prospects (2020) 49:91-96. Springer.
3. Gamage, K. A. A., Silva, E. K. de, &Gunawardhana, N. (2020). Online Delivery and Assessment during COVID-19: Safeguarding Academic Integrity. Education Sciences, 10(11), 301. https://doi.org/10.3390/educsci10110301
4. MoE & MoPME. (2020). COVID-19 Response and Recovery Plan, Education Sector.
5. Rahman, M. S., & Siddik, M. A. (2022). Need for Teachers' Professional Development in a Low-Resource Context During and After COVID-19: A Bangladesh Perspective. International Journal of Teacher Education and Professional Development (IJTEPD), 5(1), 1-14. http://doi.org/10.4018/IJTEPD.295547
6. UNESCO, (2021). Available online: https://en.unesco.org/covid19/educationresponse/support (accessed on 17 March 2022).

সচিত্র সংবাদ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে (ভার্চুয়াল) বই উৎসবে বই বিতরণ করছেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ জাকির হোসেন, এমপি, মঞ্চে উপস্থিত আছেন শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি, এমপি

ইংরেজি বিষয়ের মাস্টার ট্রেইনার প্রশিক্ষণ কর্মসূচির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি, এমপি প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ জাকির হোসেন, এমপি, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা সচিব জনাব গোলাম মোঃ হাসিবুল আলম প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (গ্রেড-১) জনাব আলমগীর মুহম্মদ মনসুরুল আলম এবং সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ

ব্লেন্ডেড শিক্ষা মহাপরিকল্পনা বিষয়ক জাতীয় টাস্কফোর্স-এর আলোচনা সভায় উপস্থিত শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি, এমপি, ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী জনাব মোস্তাফা জব্বার, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা সচিব জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম খান এবং অপর সদস্যবৃন্দ

কুড়িগ্রাম জেলার প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগের কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী

গাইবান্ধা জেলার প্রত্যন্ত চরাঞ্চলের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সাথে মাননীয় প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী

লালমনিরহাটের বিলুপ্ত ছিটমহলের প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শনে মাননীয় প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী

চিলমারী উপজেলার শিক্ষকদের সাথে মতবিনিময় অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী

মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের উপস্থিতিতে ইংরেজি বিষয়ের মাস্টার ট্রেইনার প্রশিক্ষণ (টিএমটিই) বিষয়ক চুক্তি হস্তান্তর

নোয়াখালী জেলার প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগের কর্মচারীদের পেশাগত প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানে মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর ও অতিথিবৃন্দ

সচিত্র সংবাদ

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর আয়োজিত মহান বিজয় দিবস ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা সচিব, মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর ও কর্মকর্তাবৃন্দ এবং অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীবৃন্দ

ময়মনসিংহ প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগের কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় অনুষ্ঠানে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা সচিব

ব্লেন্ডেড শিক্ষার রূপরেখা প্রণয়ন বিষয়ক কর্মশালায় বক্তব্য রাখছেন মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, প্রাগম সচিব, মহাপরিচালক, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো ও অন্যান্য কর্মকর্তা

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর কর্তকর্তাদের জন্য কর্মদক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণে বক্তব্য রাখছেন মহাপরিচালক, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো

সচিত্র সংবাদ

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমির কর্মকর্তাদের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়ন কর্মশালায় উপস্থিত নেপ অনুষদবৃন্দ

করোনাকালে শিখন-ঘাটতি পূরণে শিক্ষার্থীদের বাড়ি গিয়ে ওয়ার্কশিট বিতরণে শিক্ষা কর্মকর্তা ও শিক্ষকবৃন্দ

করোনায় স্বাস্থ্যবিধি মেনে বিদ্যালয়ের ওয়াশব্লকে শিক্ষার্থীদের হাত ধোয়া

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মডেল ভবন

মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, টাঙ্গাইল সদর-এর শিক্ষার্থীদের জন্য পাঠাগার

মুশরইল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ, পবা, রাজশাহী

জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম খান-এর প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব হিসেবে যোগদান

জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম খান ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২২ খ্রি. প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ে সচিব পদে যোগদান করেন। ইতোপূর্বে তিনি কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ এবং মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগে অতিরিক্ত সচিব পদে দায়িত্ব পালন করেন।

বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের ১৯৮৬ ব্যাচের কর্মকর্তা হিসেবে জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম খান ১৯৮৯ সালে বর্ণাঢ্য চাকরিজীবন শুরু করেন। তিনি বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগ এবং মাঠপর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি প্রথম সচিব (শ্রম) হিসেবে বাংলাদেশ দূতাবাস, কাতার এবং কমনওয়েলথ সেক্রেটারিয়েট-এর এশিয়া আঞ্চলিক যুব কেন্দ্র (Commonwealth Youth Programme)-এর প্রধান হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম খান ওআইসি সম্মেলন, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সম্মেলন, কমনওয়েলথ হেডস অব গভর্নমেন্টস এন্ড ইয়ুথ মিনিস্টার্স মিটিংয়ে অংশগ্রহণ করেন। বিভিন্ন আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সম্মেলনে তিনি কৌশলগত পেপার উপস্থাপন ও Keynote স্পিকার হিসেবে বক্তব্য প্রদান করেছেন। বিশ্বের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিজিটিং স্পিকার হিসেবে তিনি বক্তৃতা করেন। তিনি বাংলাদেশের লোকপ্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, বিসিএস (প্রশাসন) একাডেমি, নায়েম, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমি, বিয়ামসহ বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষক হিসেবে অংশগ্রহণ করে থাকেন। তিনি বিসিএস (প্রশাসন) এসোসিয়েশনের কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইংরেজি বিভাগ এলামনাই সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক। এছাড়াও তিনি বহু সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের সাথে যুক্ত।

জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম খান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগ হতে বিএ অনার্স ও এমএ এবং এলএলবি ডিগ্রি অর্জন করেন। তাঁর সহধর্মিনী বেগম রায়হানা তাসনীম একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন। পারিবারিক জীবনে তিনি দুই পুত্র সন্তানের জনক।

প্রধান উপদেষ্টা

মোঃ জাকির হোসেন, এমপি

মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

উপদেষ্টা

মোঃ আমিনুল ইসলাম খান
সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

আলমগীর মুহম্মদ মনসুরুল আলম
মহাপরিচালক (গ্রেড-১)
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

মোঃ আতাউর রহমান (অতিরিক্ত সচিব)
মহাপরিচালক
উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো

মোঃ আবু বকর সিদ্দিক (অতিরিক্ত সচিব)
মহাপরিচালক
বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ইউনিট

মোঃ আবুল বশার (উপসচিব)
পরিচালক, শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট

সম্পাদকীয় পর্ষদ

মোঃ শাহ আলম (অতিরিক্ত সচিব)
মহাপরিচালক
জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি

আরিফা সিদ্দিকা
পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব), জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি

মোহাম্মদ আহসান ইবনে মাসুদ
ঊর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞ, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি

মো. নজরুল ইসলাম
সহকারী বিশেষজ্ঞ, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি

মোহাম্মদ আবু বকর ছিদ্দিক
সহকারী বিশেষজ্ঞ, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি

মাহবুবুর রহমান
সহকারী বিশেষজ্ঞ, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি

প্রাথমিক শিক্ষা বার্তা

সম্পাদনা : ভাষা অনুষদ, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি
প্রকাশক : জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি
প্রকাশকাল : মার্চ ২০২২

Primary Education Newsletter

Edited by : Faculty of Language Education, NAPE
Published by : National Academy for Primary Education
Published Date : March 2022

সম্পাদকীয় যোগাযোগ : Phone : 02 996 666 165, E-mail : language.nape@gmail.com

মুদ্রণ : সবুজ প্রাঙ্গণ, ৯ আমপট্টি রোড, ময়মনসিংহ ॥ মোবাইল : ০১৭৭৭ ৫৩২ ১৪৪, E-mail : sabujprangon21@gmail.com